॥ ছোটদের প্রাইজ ও লাইব্রেরীর উপযোগী অভিনব গ্রন্থ ॥

বিজ্ঞানের বৈচিত্র্য

মণীন্দ্রনাথ দাস

৮ এ, টেমার লেন ● কলিকাতা ৯

উৎসর্গ

পরম পূজনীয় পিতামহ
যোগেন্দ্রনাথ দাস
(১৮৫৪—১৯১৮)
ও
পরম পূজনীয় মাতামহ
সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র
(১৮৮০—১৯১৯)
উভয়ের পুণ্যস্মৃতিতে

ভূমিকা

ভারতীয় ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক লেখার প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও এ জাতীয় পুস্তকের স্বল্পতা পরিলক্ষিত হয়। বাংলা ভাষাভাষী জনসাধারণ, বিশেষতঃ কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী বিজ্ঞানের তথ্য সম্বলিত বাংলায় লিখিত পুস্তকের আবশ্যকতা রহিয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের এই পুস্তকখানি সে আবশ্যকতা পূরণ করিতে সহায়ক হইবে।

বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ দাস ইতিমধ্যেই সুপরিচয় লাভ করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত 'বিচিত্র প্রসঙ্গ', 'বিজ্ঞানের যাদু', 'স্বর্ণ ও মণিরত্নের কথা' পুস্তক সকল সমাদর লাভ করিয়াছে।

বর্তমান পুস্তক 'বিজ্ঞানের বৈচিত্র্য'র তথ্য সম্ভার জন ও সময় উপযোগী, ইহার বক্তব্য পরিষ্কার, ভাষা সাবলীল। পাঠক সমাজে ইহা যে সবিশেষ সমাদর লাভ করিবে—সে বিশ্বাস আমি রাখি।

শ্রীঅমিয় কুমার দত্ত
এম-এস-সি
ভূবৈজ্ঞানিক ও অধ্যক্ষ
কয়লা সমীক্ষা গবেষণাগার
কেন্দ্রীয় ইন্ধন অনুসন্ধান সংস্থা, রাঁচি

সূচীপত্র

বিশ্বের বৈচিত্র

আমাদের এই পৃথিবীতে অনেকরকম বিস্ময়কর জড়বস্তু, আশ্চর্য্য উদ্ভিদ ও অদ্ভুত প্রাণী রয়েছে। এ বিষয়ে চিন্তা করে দেখলে অবাক হতে হয়। এবার এদের বিষয় কিছু কিছু আলোচনা করা যাক।

ভৌগোলিক বিস্ময়: পৃথিবীর উত্তর মেরুতে সব দিকই দক্ষিণ দিক, আর দক্ষিণ মেরুতে প্রত্যেক দিকই উত্তর দিক। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে এক এক সময় সূর্য্য ও চাঁদ পরস্পরের বিপরীত দিকে থেকে আকাশ প্রদক্ষিণ করে। যে সোনার ওজন নীরক্ষ বৃত্তে ১০০০ গ্রাম হবে, মেরু প্রদেশে নিয়ে গেলে তারই ওজন দাঁড়াবে ১০০৫ গ্রাম, কারণ মেরুপ্রদেশ হতে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল বিষুব অঞ্চলের তুলনায় ২৩½ মাইল কাছে রয়েছে, সেজন্য এই স্থানে মাধ্যাকর্ষণের টান কিছু বেশী হয়ে থাকে। মেরু প্রদেশে আকাশ হতে পতিত আলোক রশ্মি তুষারের ওপর প্রতিফলিত হয় বলে সেখানে কোন বস্তুর ছায়া সহজে চোখে পড়ে না।

মাটির যত নীচে নামা যায়, ততই ঋতু পরিবর্ত্তনজনিত তাপমাত্রার তফাৎ কম হয়, এমন কি একটা নির্দ্দিষ্ট স্তরে এসে পৌঁছলে সারা বছরেও তাপমাত্রার কোন পার্থক্য দেখা যায় না। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস নগরীর প্রায় ত্রিশ গজ নীচে কোন ভূগর্ভস্থ কক্ষে ১৮০ বছর আগে বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়ার যে থার্মোমিটার স্থাপন করেছিলেন—এতদিনের মধ্যে, এত সময়ের পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও তাতে এক চুলও তাপমানের তফাৎ দেখা যায়নি। এখানে শীত, গ্রীষ্ম, হেমন্ত, বসন্ত—সকল ঋতুতেই তাপমাত্রা চিরস্থির থাকে।

প্যালেস্টাইনে একটি বিশাল হ্রদ আছে যার নাম ডেড্‌সি বা মৃত সাগর। এই ৪৭ মাইল লম্বা জলাশয়টি ৩৪০ বর্গমাইল স্থান জুড়ে

আছে। এতে জর্ডন নদীর জল এসে জড় হয়। এই হ্রদের জল শতকরা ২৫ ভাগ লবণ জাতীয় পদার্থে পরিপূর্ণ, সেজন্য খুব ঘন। এই জলে কোন মাছই বাঁচতে পারে না। মানুষের শরীর সহজেই ঐ জলের ওপর ভাসে। উত্তর আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অন্তর্গত ইয়েলোষ্টোন জাতীয় প্রমোদ উদ্যানে "চির বিশ্বস্ত" নামে একটি আশ্চর্য্য উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। প্রায় সাতদিন পর পর এক ঘণ্টা অন্তর এ থেকে ফোয়ারার মত ১৫০ ফিট উঁচু গরম জলের ধারা নির্গত হতে থাকে। এই ইয়েলোষ্টোন পার্কেই একটি স্বাভাবিক কাঁচের পাহাড় আছে, এই শৈলশিখর অবসিডিয়ান নামক কাঁচ দিয়ে গঠিত।

উত্তর আমেরিকাতে একটি 'অগ্নিগর্ভ নদী' আছে, এর জলের ওপরটা ঠাণ্ডা কিন্তু নীচের দিকে বেশ গরম। আমেরিকায় দুই সাগরের স্রোত বলে এক অববাহিকা আছে, যার জলধারা আটল্যান্টিক ও প্যাসিফিক উভয় মহাসাগরে গিয়ে পড়ে। আমেরিকান অভিযানকারী জিম ব্রিজার কাঁচের পাহাড়, অগ্নিগর্ভ নদী ও দুই সাগরের স্রোত আবিষ্কার করেন।

দক্ষিণ মেরু প্রদেশে ভষ্টক নামক জায়গা পৃথিবীর শীতলতম স্থান, এখানকার তাপমাত্রা—১২৭° ফারেনহাইট অবধি নেমে গিয়েছে। উত্তর রাশিয়ায় ভারখোয়েনস্ক বলে এক বসতি আছে, সেখানে শীতকালে থার্মোমিটারের পারদ—৯০° পর্য্যন্ত নেমে যায়। উত্তর আফ্রিকায় লিবিয়া অঞ্চলের অন্তর্গত আজিজিয়া ও উত্তর আমেরিকার মেক্সিকো প্রদেশে অবস্থিত সান লুইস----এই উভয় স্থান পৃথিবীর মধ্যে উষ্ণতম স্থল। এই দুই জায়গায় তাপমাত্রা ১৩৬° ফারেনহাইট পর্য্যন্ত উঠে থাকে। আসামের অন্তর্গত চেরাপুঞ্জী সর্বাপেক্ষা বৃষ্টিবহুল জায়গা: এখানে গড়ে প্রতিবছর ৫০০ ইঞ্চিরও বেশী বারিপাত হয়। ১৮৬০—৬১ সালে এখানে এক বছরের মধ্যে এক হাজার ইঞ্চিরও বেশী বৃষ্টি বর্ষণ হয়েছিল।

প্রবল ঝড়ের সময় বায়ুর বেগ ঘণ্টায় ২০০ থেকে ৬৮০ মাইল অবধি হতে পারে। ঝটিকাক্ষুব্ধ সমুদ্রের জলে এক এক সময় ৬০

থেকে ১১২ ফিট পর্য্যন্ত উঁচু ঢেউ উৎপন্ন হতে দেখা যায়। আকাশ থেকে পড়া পৃথিবীর বৃহত্তম উল্কাপিণ্ড দক্ষিণ আফ্রিকায় আছে, এটি ৯ ফিট লম্বা ও ৮ ফিট চওড়া এবং প্রায় ৬৬ টন ভারি।

ধাতুর রাজ্যে: রূপার মত সাদা লিথিয়ামই সর্ব্বাপেক্ষা হালকা ধাতু, এর আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রায় ·৫৩৪। এই ধাতু সহজেই জলে ভাসে। ১৮১৭ সালে সুইডেনের বৈজ্ঞানিক জোহান আর্ভেডসন এই লঘু লিথিয়াম ধাতুটি আবিষ্কার করেন। ১৮০৪ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্মিথসন টেনাণ্ট সবচেয়ে গুরুভার ধাতু অসমিয়াম্ আবিষ্কার করেন। অসমিয়াম্ দেখতে নীলাভ ধূসর রঙের হয়, এর আপেক্ষিক গুরুত্ব, ২২·৪৮। শীতকালে যখন থার্মোমিটারের পারদ ১৮° সেন্টিগ্রেডের নীচে নেমে যায়, তখন বিশুদ্ধ টিন বা রাং একরকম ধূসর বর্ণের চূর্ণে পরিণত হয়।

পারদই একমাত্র ধাতু যা সাধারণ তাপমাত্রায় তরল অবস্থায় থাকে। এই পারাই আবার—৩৮·৮৫° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় জমে গিয়ে কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পারা বাদ দিলে সিসিয়াম ধাতুর গলনাঙ্ক সব থেকে কম। জার্মান বিজ্ঞানী বুনসেন ও কার্চফ ১৮৬০ সালে উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণের ধাতু সিসিয়াম আবিষ্কার করেন। এই ধাতু ২৮·৬° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় গলে যায়। অপরদিকে টাঙ্গস্টেন ধাতুর গলনাঙ্ক সবচেয়ে বেশী, টাঙ্গস্টেন ৩৩৮০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় গলে যায়। স্পেন দেশের বৈজ্ঞানিক ভাতৃদ্বয় জুয়ান জোষী ও ফষ্টো এল লুইয়ার ১৭৮৩ সালে ধূসর বর্ণের এই ধাতু আবিষ্কার করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ট্যাণ্টালাম কার্বাইড নামের যৌগিক পদার্থ ৩৮৭৭° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

সোনা সর্বাপেক্ষা ঘাতসহ বস্তু। এক আউন্স সোনা থেকে প্রায় ৫০ মাইল লম্বা তার টানা যায়। সোনা পিটে এক ইঞ্চির দু'লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র পুরু পাত প্রস্তুত করা সম্ভব।

রাসায়নিক হিউসলার ৬১ ভাগ তামা, ২৪ ভাগ ম্যাঙ্গানিজ ও ১৫ ভাগ এলুমিনিয়াম মিশিয়ে একরকম অদ্ভুত মিশ্রধাতু তৈরী করেছেন,

যা চুম্বক কর্তৃক সজোরে আকৃষ্ট হয়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এর প্রত্যেকটি উপাদান পৃথকভাবে কোন চুম্বকের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয় না।

খনিজ দ্রব্যে : ব্যরাইট নামক খনিজদ্রব্য অঙ্গারের সঙ্গে গরম করলে কিম্বা সামুদ্রিক ঝিনুক গন্ধকের সহযোগে উত্তপ্ত করলে যে রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত হয়, তা প্রখর সূর্য্যালোকে কিছুক্ষণ রেখে অন্ধকারে আনলে, তখনও তা থেকে মৃদু আলো বার হতে থাকে। ষোড়শ শতাব্দীতে বোলগনার অধিবাসী ইটালীয়ান বৈজ্ঞানিক ক্যাস্কারিওলো এই জাতীয় জ্যোতিষ্মান বস্তু আবিষ্কার করেন, যাদের সূর্য্যের সোনালী আলো শোষণ ও সংরক্ষণ করবার ক্ষমতা আছে।

স্পডুমিন নামের সিলিকেট শ্রেণীর খনিজ পদার্থের কৃষ্টাল এক এক সময় ৪০ ফিট লম্বা ও ৯০ টন অবধি ভারি হয়। ম্যাডাগাস্কার ও ক্যালিফোর্ণিয়াতে সুন্দর বেগুনী রঙের একরকম স্পডুমিন পাওয়া যায়। এথেকে ছোট ছোট টুকরো কেটে রত্নরূপে ব্যবহার করা হয়।

ইটাকলুমাইট বলে এক প্রকার বেলে পাথর আছে। স্ফটিক, অভ্র ও বালির কণা যখন লৌহ অক্সাইড, সিলিকা কিম্বা চুন সহযোগে প্রাকৃতিক কারণে একসঙ্গে জুড়ে যায়, তখন এই পাথর সৃষ্টি হয়। এই পাথর প্লেটের মত পাতলা অবস্থায় বেশ নমনীয় হয়, সেজন্য এর অপর নাম Flexible Sandstone বা স্থিতিস্থাপক বেলে পাথর। ভারতবর্ষে পাঞ্জাবে ও আমেরিকায় ক্যারোলিনা প্রদেশে ও ব্রেজিলে এই প্রস্তরের আকর আছে।

ক্যালসাইট বলে এক রকম খড়ির কৃষ্টাল হয়। এই পাথর বর্ণহীন সাদা, সোনালী, লাল, নীল, বাদামী বহু বিচিত্র রকম হয়। এর রাসায়সিক উপাদান ক্যালসিয়াম কার্ব্বনেট। প্রাপ্তিস্থান আইসল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালি ও আমেরিকা এবং ভারতবর্ষের রাজস্থান অঞ্চল। ১৬৬৯ সালে বার্থোলিন নামের এক বৈজ্ঞানিক প্রথম লক্ষ্য করে দেখেন যে এই পাথরের আলোকবক্রণ ক্ষমতা দ্বিবিধ। কোন রেখাকে এই প্রস্তরের মধ্য দিয়ে দেখলে দুটি বলে

মনে হয়। কিম্বা কোন বিন্দুর ওপর এই পাথর বসিয়ে দেখলে দুটি বিন্দু বোধ হয়, এই সময় পাথরখানি ধীরে ঘোরালে এক বিন্দুর চারিপাশে অন্য বিন্দুকে আবর্ত্তিত হতে দেখা যায়। প্রসিদ্ধ আমেরিকান খনিজ তত্ত্ববিদ এডওয়ার্ড জনা লিখেছেন কোন কোন ক্যালসাইট প্রস্তর উত্তপ্ত করলে কিম্বা সূর্য্যালোকে রেখে অন্ধকারে আনলে অথবা রেডিয়াম রশ্মির সম্মুখে স্থাপন করলে এথেকে ক্ষীণ জ্যোতি বিকিরণ হতে থাকে। আলোকরশ্মি একমুখী (Polarise) করবার যন্ত্রে এই প্রস্তর খণ্ড ব্যবহৃত হয়। দুই আঙ্গুল দিয়ে জোরে চেপে ধরলে ক্যালসাইটে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। ক্যালসাইট ৩০০ রকমের এবং ১০০০ প্রকার গঠন সম্পন্ন হতে পারে। একবার একটি বেশ বড় স্বচ্ছ ক্যালসাইট কৃষ্টাল আইসল্যাণ্ডে পাওয়া যায়, যা লম্বায় প্রায় ২০ ফিট ছিল। মেক্সিকো প্রদেশে ২৫ টনের বেশী ওজনের ক্যালসাইট পাথর দেখা গেছে।

পিউমিস বলে যে আগ্নেয় শিলা আছে তা খুব ছিদ্রবহুল বায়ুপূর্ণ হয়, সেজন্য জলে পড়লে কিছুক্ষণ ভাসতে থাকে। এর প্রধান উপাদান প্রাকৃতিক কাঁচ। ইটালির নিকটবর্ত্তী লিপারী দ্বীপপুঞ্জ ও অন্যান্য আগ্নেয়গিরি অঞ্চলে এই পাথর পাওয়া যায়। কোন কোন চুণী ও নীলা গোল পৃষ্ঠ করে কাটলে তাতে ছয় রশ্মিযুক্ত এক তারা দেখা যায়। বৈদূর্য্য বলে আর এক রকম পাথর গোল করে কাটলে ওতে বিড়াল চক্ষুর মত শ্বেত রেখা পাওয়া যায়। আলেকজাণ্ড্রাইট নামক আর এক জাতীয় বৈদূর্য্য পাথর দিনের আলোতে সবুজ মনে হয় আর রাত্রি বেলাকার কৃত্রিম আলোতে রক্তাভ বোধ হয়।

এবার গাছপালার বিষয় আলোচনা করে দেখা যাক। ডিক্টামনাস বলে একরকম তীব্র সুগন্ধযুক্ত ফুলের গাছ আছে। এই গাছের পুষ্পস্তবকের চারিদিকে সব সময় একপ্রকার সুগন্ধ সহজ দাহ্য বাষ্প বর্ত্তমান থাকে, সেজন্য এর কাছে দেশলাই জ্বাললেই তৎক্ষণাৎ চতুঃ-পার্শ্বে নীলাভ অগ্নিশিখা আবির্ভূত হয়। ইউরোপে বারবেরি গাছে যে হলদে রঙের ফুল হয় তাতে একটি গর্ভকেশরকে ঘিরে ছয়টি পুংকেশর

থাকে। কোন পুংকেশরের গোড়ার দিকে সূচ দিয়ে স্পর্শ করামাত্র সেটি সঙ্গে সঙ্গে স্প্রিংয়ের মত ঠেকে গিয়ে স্ত্রীকেশর স্পর্শ করে। লজ্জাবতী লতা স্পর্শ করলে বা সজোরে নাড়া দিলে ছোট পাতাগুলি তাড়াতাড়ি মুড়ে যায়, কিন্তু ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করলে লজ্জাবতী অসাড় হয়ে পড়ে এবং তার স্পর্শকাতরতা বিলুপ্ত হয়। এদেশে বন চাঁড়াল গাছের পাতার স্বতঃ সঞ্চালন অনেকেই দেখেছেন। এই গাছের পাতার গোড়ায় দুটি ছোট ছোট পত্রক থাকে। উজ্জ্বল উষ্ণ দিনে গাছটির যখন বেশ সহজ অবস্থা হয়, তখন প্রত্যেক পাতার মূলে ঐ ক্ষুদ্র পত্রক দুটি নিজে নিজেই ওঠানামা করতে থাকে। কিন্তু বাতাসের তাপমাত্রা ৬৮° ফারেনহাইট পর্যন্ত নামলে আর বনচাঁড়ালের স্বতঃ স্পন্দন দেখা যায় না।

শিশির পত্র, কলসী গাছ, ভিনাসের মক্ষিকা পাশা, ঝাঁজি প্রভৃতি মাংসাশী গাছের পতঙ্গ শিকার খুবই আশ্চর্য্যজনক। কোন কোন ছত্রাক জাতীয় গাছের খদ্যোতের মত অন্ধকারে আলোক প্রদান সত্যই খুব বিস্ময়কর। কালিদাস তাঁর কুমার সম্ভবে লিখে গেছেন যে বনচর নরনারীর গুহায় স্বয়ংপ্রভ জ্যোতিষ্মান উদ্ভিদ বাসর প্রদীপের মত জ্বলতে থাকে। পাইলিয়া বলে যে গাছ আছে তাতে খুব ছোট ছোট ফুল ধরে। এই সব ফুলের ওপর যদি জলের ছিটা দেওয়া হয়, তাহলে তৎক্ষণাৎ পরাগস্থলী ফেটে গিয়ে ধোঁয়ার মত পুষ্পপরাগ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

মালয় দেশে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ফুল জন্মায়, এই ফুলের নাম র‍্যাফ্লেসিয়া। এই ফুলের ব্যাস দুই হাত এবং ওজন প্রায় সাড়ে সাত সের। সবচেয়ে বড় বীজ কোষ হয় যুগ্ম নারকেল, যার ওজন প্রায় আধমন পর্যন্ত হতে পারে। কোন কোন পাম গাছের পাতা ৬৫ ফিট পর্য্যন্ত লম্বা হতে পারে। দক্ষিণ আমেরিকার পদ্ম জাতীয় জলজ গাছ ভিক্টোরিয়া রিজিয়ার পাতার ব্যাস ১২ ফিট অবধি হয়। কাঁঠাল ও কুমড়ো পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম ফল বলা যেতে পারে, এদের প্রত্যেকটির ওজন দুই মণ আড়াই মণ পর্য্যন্ত হওয়া

সম্ভব। জগতের বৃহত্তম জীব ক্যালিফোর্ণিয়া প্রদেশের সিকুইয়া নামের গাছ। এই বিশাল বৃক্ষ তিনশত ফিট উঁচু, ত্রিশ ফিট চওড়া ও প্রায় ৩০০০ টন ভারি হয়। এই গাছের আয়ু প্রায় ৪০০০ বছর হয়ে থাকে।

ম্যাঞ্চুরিয়াতে পীট বা অর্দ্ধ কয়লার স্তরে যে পদ্ম জাতীয় গাছের বীজ পাওয়া গেছে তা থেকে প্রায় হাজার বছর পরে ওয়াশিংটন পার্কে ১৯৫২ সালে অঙ্কুর উদগম হয়েছে।

শৈবাল শ্রেণীর গাছ লাইকো পোডিয়ামের রেণু বেশ করে হাতে লাগিয়ে নিয়ে জলে ডোবালে কিছুতেই ভেজে না। মেক্সিকো অঞ্চলে এবং এদেশেও একরকম শিম গাছ জন্মায় যার বীজ কোন জায়গায় রাখলে মাঝে মাঝে আপনা হতে লাফিয়ে ওঠে। এর কারণ ঐ বীজ মধ্যস্থ কোন কীটের দ্রুত সঙ্কোচন ও প্রসারণ।

গম গাছের সমস্ত শাখা প্রশাখা মাপলে প্রায় সিকি মাইল লম্বা হয়। বাঁশ গাছ প্রতিদিন প্রায় এক হাত করে বাড়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরাজ বৈজ্ঞানিক বেল্‌স পরীক্ষা করে দেখেন জলে ভেজানো নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সীম বীজ ফুলে ওঠবার সময় প্রায় আড়াই মণ ওজন ওপরে তুলতে পারে।

প্রাণীজগতে : এবার প্রাণীজগতের বৈচিত্র্যের বিষয় আলোচনা করে দেখা যাক। ম্যালেরিয়া জীবাণু জগতের ক্ষুদ্রতম প্রাণী, এদের দেহের বিস্তার এক ইঞ্চির আট হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র।

অন্যদিকে নীল তিমি পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তর প্রাণী। এরা ১০০ ফিট লম্বা এবং ওজনে প্রায় ৩০০০ মণ অবধি ভারি হয়ে থাকে। একটি নীল তিমির ওজন প্রায় ৩০টি হাতির সমান।

এখানে উল্লেখযোগ্য জগতের সবচেয়ে বড় জীবাণু হল গন্ধক ব্যাকটিরিয়া। এরা প্রায় এক সেন্টিমিটার পর্য্যন্ত লম্বা হয়, সেজন্যে এদের খালি চোখেও দেখা সম্ভব। অন্যদিকে পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম জীবাণু—ভাইরাস বা বিষাণুর শারীরিক দৈর্ঘ্য $\frac{১}{৩১২৫০০০}$ ইঞ্চি থেকে $\frac{১}{১৫৬২৬০}$

ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। অবশ্য ব্যাকটিরিয়া ও ভাইরাসকে সাধারণত উদ্ভিদ শ্রেণীভুক্ত বলে মনে করা হয়।

পুরীর সমুদ্রজলে অন্ধকার রাত্রিতে আলোক উদ্ভাসিত হতে দেখে অনেকেই হয়ত বিস্মিত হয়েছেন। সমুদ্র জলের আলো বিকিবণকারী কারণ ন'কটি লুকা মিলিয়ারিস নামক আলোক বিকিরণকারী অসংখ্য জীবাণুর অস্তিত্ব। পচনশীল খড় ও ঘাসপাতার স্তূপে বিনা কারণে কখনও কখনও আপনা হতেই হঠাৎ আগুন লেগে যেতে দেখা যায়। এর হেতু তাপোৎপাদক জীবাণুর ক্রিয়াশীলতা।

মৌমাছি, পিঁপড়ে, উইপোকা প্রভৃতি সামাজিক কীটপতঙ্গের মধ্যে দেখা যায় স্ত্রীপতঙ্গ নিষিক্ত ডিম (Fertilized Egg) আর পুরুষ পতঙ্গ অনিষিক্ত ডিম (Unfertilized Egg) থেকে উৎপন্ন হয়। জীবজগতে এ আশ্চর্য্য ব্যতিক্রম। একজাতীয় পুরুষ প্রজাপতির ঘ্রাণেন্দ্রিয় এত সূক্ষ্মাণুভূতিসম্পন্ন যে এক মাইল দূব থেকে এরা স্ত্রী-প্রজাপতিব উপস্থিতি জানতে পেবে তার কাছে উড়ে আসে।

ভারতীয় সাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের প্রবাল দ্বীপে একপ্রকার বিশালকায় ঝিনুক বাস করে। এদের দৈহিক বিস্তার প্রায় ৪ ফিট এবং ওজন ৫০০ পাউণ্ড অবধি হয়ে থাকে। শোনা যায় এরা নাকি মানুষকেও আক্রমণ করতে ভয় পায় না। এই সব ঝিনুক ১০০ বছর পর্য্যন্ত অনায়াসে বেঁচে থাকে।

প্রাণীজগতের সবচেয়ে বেশী বিস্ময়কর বোধহয় বৈদ্যুতিক মাছ। বৈদ্যুতিক বাইন ও বিজলী রশ্মি মাছের তড়িৎ উৎপাদক যন্ত্র তাদের পেশীসমষ্টি। ব্রেজিলের নদী ও জলাশয়ে যে জাতীয় বাইন মাছ পাওয়া যায় তাদের বিদ্যুৎ সঞ্চার ক্ষমতা সর্ব্বাধিক। এদের বৈদ্যুতিক শক্তি কয়েক শো ভোল্ট পর্য্যন্ত হয়। ছোট ছোট মাছ ও ব্যাঙ বৈদ্যুতিক বাইনের সংস্পর্শে এলে তীব্রভাবে তড়িতাহত হয়ে অবিলম্বে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়। মানুষ ও অন্যান্য বড় জীবজন্তু এই মাছের বিদ্যুৎ সঞ্চারের ফলে অবশ হয়ে পড়ে। নিউইয়র্কের কোন জলাধারে

এমন একটি বড় বৈদ্যুতিক বান মাছ ছিল, যার বিজলী শক্তির প্রভাবে বাতি জ্বালানো ও ঘণ্টা বাজানো সম্ভব হয়েছিল।

বিজলী রশ্মি মৎস্য ভূমধ্যসাগরে বসবাস করে। বড় বড় বিজলী রশ্মি মৎস্যের বৈদ্যুতিক শক্তি বিশ থেকে ত্রিশ ভোল্ট পর্য্যন্ত হয়। কোন ইস্পাতের শলাকা তারের কুণ্ডলীর মধ্যে রেখে ওই কুণ্ডলীতে বিজলী রশ্মি মাছের বিদ্যুৎ সঞ্চালন করলে ঐ ইস্পাত চুম্বক হয়ে যায়। বৈদ্যুতিক টরপেডো মাছ ঠিক বেহালার মত দেখতে, এরা গ্রীষ্মাঞ্চলের সমুদ্র জলে থাকে। এদের প্রত্যেকটির ওজন প্রায় ১০০ কিলোগ্রাম। টরপেডো মাছ ৩০০ ভোল্টে প্রায় ৮ অ্যাম্পিয়ার আন্দাজ বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে।

আফ্রিকার নীলনদে মরিমাইরাস বলে একপ্রকার বিচিত্র বৈদ্যুতিক মাছ আছে। এদের শরীরে এক 'রেডার যন্ত্র' সংযুক্ত আছে। এদের লেজের গোড়ার দিকে এমন ব্যবস্থা আছে যে সেখানে অনবরত সেকেণ্ডে কয়েকশ বার পর্য্যায় ক্রমিক বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, যার ফলে পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন বস্তু কর্ত্তৃক, এই মাছের বৈদ্যুতিক চৌম্বক ক্ষেত্র অল্পাধিক বিপর্য্যস্ত হয় এবং মৎস্যজাত বিদ্যুৎতরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত একটি গ্রাহক যন্ত্র দ্বারা সঙ্গে সঙ্গে গৃহীত হয়। এই জৈব রেডার যন্ত্র অত্যন্ত অনুভূতি সম্পন্ন, সেজন্য মরিমাইরাশ মাছ কোন জালে ধরা পড়ে না। কোন জলাধারে মরিমাইরাস রেখে দূর থেকে চুল আঁচড়ালে যে স্থির বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, তাতেই এই মাছ উত্তেজিত ও চঞ্চল হয়ে ওঠে।

ভারতে কখনও কখনও প্রবল ঝড়ের সময় জলস্তম্ভের সঙ্গে জীবন্ত মাছ আকাশে উঠে গিয়ে আবার বাতাসের ঝাপটায় মাটিতে এসে পড়ে।

অধিকাংশ সাপের একটি মাত্র ফুসফুস থাকে। এদের বাঁদিকের ফুসফুস একেবারেই থাকে না কিম্বা খুব ছোট ও অপূর্ণ অবস্থায় রয়ে যায়। র‍্যাটেল ও অন্যান্য বোড়া জাতীয় সাপের নাক ও চোখের মাঝখানে একটি করে ছোট গর্ত্ত থাকে, এই ছিদ্রদ্বয় লোহিতাতীত তাপ

বিকিরণ সম্পর্কে বিশেষ অনুভূতিসম্পন্ন। কোন কোন বোড়া সাপের কাছে হাত রেখে দেখা গেছে, ওরা এক ফুট দূর হতেই হাতের উত্তাপ অনুভব করতে সক্ষম। কোন কোন বোড়া ও অজগর কিছুমাত্র আহার্য গ্রহণ না করেও কখনও কখনও এক বৎসরের বেশী বেঁচে থাকতে পারে।

দক্ষিণ আমেরিকার নিকটবর্ত্তী গ্যালাপ্যাগস দ্বীপের কচ্ছপ প্রায় ছয় ফুট দীর্ঘ ও এক হাজার পাউণ্ড ভারি হয়। এদের আয়ু ১৫০ বছর পর্য্যন্ত হতে পারে। এই সব বড় বড় কচ্ছপ কিছু না খেয়েও এক বছর পর্য্যন্ত জীবিত থাকতে পারে।

মহামতি ডারউইন লিখেছেন, সাদা রঙের পুরুষ বিড়ালের নীল চোখ থাকলে সেই সঙ্গে তাদের কালা হতে দেখা যায়। বিজ্ঞানী ডারউইন ও ডাক্তার হেল হোয়াইট দু'জনেই বলেছেন যে কোন বিষদ্রব্য শ্বেতবর্ণের ভেড়া শূয়োর ও ইঁদুর এবং গাঢ় বর্ণের ঐ জাতীয় জন্তুর শরীরে বিভিন্ন-ভাবে ক্রিয়াশীল হয়।

আয়ারল্যাণ্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীতে চার্লস ও ব্রায়ান বলে এক দীর্ঘাকৃতি মানুষ ছিলেন, যাঁর উচ্চতা ছিল ৭ ফিট ৯ ইঞ্চি। ১৯০৫ সালে লণ্ডনের কোন প্রদর্শনীতে ম্যাকনভ নামে একজন রাশিয়ান দীর্ঘদেহীকে দেখা যায়, এর উচ্চতা ছিল ৯ ফিট ৩ ইঞ্চি জেমস টলার বলে আর একজন ইউরোপীয় ভদ্রলোকের কথা জানা যায়, ইনি মাত্র ১৭ বছর বয়সেই ৮ ফিট উঁচু হয়েছিলেন।

সাইমন পাপ বলে একজন বামন যিনি মাত্র ২ ফিট ৪ ইঞ্চি লম্বা ছিলেন। বিখ্যাত আইরিশ বামন ওয়েন ফেরেল ৩ ফুট ৯ ইঞ্চি লম্বা ছিলেন। শোনা যায় প্রাচীন আলেকজাণ্ড্রিয়া নগরে এলপিয়াস বলে একটি ক্ষুদ্রাকৃতি ব্যক্তি ছিলেন, যিনি মাত্র ১৭ ইঞ্চি লম্বা হয়েছিলেন। বিশেষজ্ঞদের অভিমত পিটুইটারি গ্রন্থি যৌবনারম্ভে অতিরিক্ত সক্রিয় হলে মানুষ দীর্ঘদেহী হয়, আর এই গ্রন্থি কোন কারণে অকর্মন্য হয়ে পড়লে শারীরিক বৃদ্ধিও স্থগিত হয়ে যায়।

আমেরিকাতে রুথ পন্টিকো বলে একজনের ওজন ছিল ৮১৫

টাকা দিল না। তখন সুরেশ প্রফুল্লর কাছে এলো এবং দাদাকে ভাল করবার জন্য মাদুলী এনে দেবে বলে প্রফুল্লর কাছ থেকে মাকড়ি চেয়ে নিয়ে গেল—উদ্দেশ্য, সেটা বন্ধক দিয়ে কিছু অর্থ সংগ্রহ করা। কিন্তু মাকড়ি তো ফেরৎ পাওয়া চাই। তাই সে রমেশের নামে একখানা কাগজে লিখে রেখে গেল "মেজদাদা, মেজবৌদির মাকড়ি নিয়ে অন্নদা পোদ্দারের দোকানে দশ টাকায় বাঁধা দিয়েছি।" তার বিশ্বাস ছিল, সেই চিরকুট পড়ে রমেশ নিশ্চয়ই মাকড়ি ছাড়িয়ে আনবে। কিন্তু ঐ মাকড়ির সূত্র ধরেই রমেশ এক ভীষণ ষড়যন্ত্র করল।

পরদিন যোগেশ মদের নেশা কেটে যাবার পর অনুতপ্তচিত্তে স্থির করলেন, সম্পত্তি বিক্রি করে পাওনাদারদের টাকা শোধ করবেন। রমেশ সম্পত্তি জ্ঞানদার নামে বেনামী করার প্রস্তাব করতে যোগেশ বললেন, "লোকের কাছে জোচ্চোর হব! আমার সর্বনাশ হয়েছে বটে, কিন্তু বড়গলা করে বলতে পারি কখনো প্রবঞ্চনার দিক দিয়ে চলিনি।" এই সময়ে রমেশ ময়রাদের ওলাওঠাগ্রস্ত ছেলেকে ব্রাণ্ডি দেবার অছিলায় মদের বোতলটি যোগেশের সামনে রেখে গেল। তার উদ্দেশ্য স্পষ্ট: "বিষয়গুলো যে ব্যাপারি ব্যাটারা বেচে নেবে, তা প্রাণে সইছে না। দাদা যখন মদ ধরেছে সই করে নেবার কথা ভাবি না। আজই হোক, কালই হোক, মর্টগেজ সই করিয়ে নিচ্ছি। ভাবনা রেজেস্টির, তা তখন দেখা যাবে। মদ আমার সহায়, জুড়ুতে দেওয়া হবে না, দাদাকে আজই মদ খাওয়াতে হবে। দাদাকেও ফাঁকী দেওয়া চাই, ব্যাপারীগুলোকেও ঠকানো চাই।"

রমেশের উদ্দেশ্য সফলও হল। সে চলে যাবার পর যাদব এসে খবর দিল, "বাবা, ছোট কাকাবাবু চোর হয়েছে, কাকীমার মাকড়ি নিয়ে গেছে।" বলা বাহুল্য এই ঘটনার মধ্যে রমেশের কারসাজি ছিল।

এই ভয়ঙ্কর সংবাদ শুনে যোগেশ আবার ভেঙে পড়লেন। সামনেই

জীবাণু-জগৎ

১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে হল্যাণ্ডের অধিবাসী অ্যান্টনি লিউয়েনহোয়েক (১৬৩২-১৭২৩) সর্বপ্রথম প্রচার করেন—জল, স্থল ও অন্তরীক্ষে অতি ক্ষুদ্র অসংখ্য অদৃশ্য জীবাণু বর্তমান। তিনি বিবর্ধক কাচের সাহায্যেই এই যুগান্তকারী আবিষ্কার করিয়াছিলেন। লিউয়েনহোয়েক সর্বসমেত চারি শত অণুবীক্ষণ যন্ত্র স্বহস্তে প্রস্তুত করেন। এই সকল অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কেবল একটি করিয়া বিবর্ধক কাচ থাকিত, যাহার ব্যাস এক ইঞ্চির আট ভাগের এক ভাগ মাত্র। ইহার দ্বারা কোন ক্ষুদ্র বস্তুকে ১০০ হইতে ২০০ গুণ বড় দেখা যাইত। লিউয়েনহোয়েক ডোবার জলে অতি ক্ষুদ্র জীবাণুর সন্ধান পান, তিনিই প্রথম বীজকোষ (Sperm cell) আবিষ্কার করেন এবং রক্তে লোহিত কণিকার অস্তিত্ব দেখেন।

আধুনিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রে যে কোন বস্তুকণাকে ১৫০০ হইতে ২৫০০ গুণ পর্যন্ত বড় দেখায়, আর ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের সাহায্যে যে কোন সূক্ষ্ম পদার্থের লক্ষ গুণ বড় ছবি তোলা যায়।

মাটি, জল ও বাতাসে বিভিন্ন প্রকার জীবাণু বাস করে। এই সকল ক্ষুদ্রতম জীবাণু অত্যন্ত কঠিন-প্রাণ। বেলুনের সাহায্যে আকাশের ৯৯০০০ হাজার ফুট উর্ধ্বস্তরের বাতাস আনিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহাতেও যথেষ্ট পরিমাণ জীবাণু-বীজের অস্তিত্ব আছে। উর্ধ্বাকাশ হইতে পতিত হিমশীতল শিলাতেও জীবাণু বীজ পাওয়া যায়। অন্য দিকে ২৪০০০ ফুট নীচে সাগরতলেও অনেক প্রকার জীবাণুর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এখানে জলের চাপ সাধারণ বাতাসের চাপের চেয়ে প্রায় ৮০০ গুণ বেশী। ঈষ্ট-কোষ (Yeast cell) ৮০০০ গুণ বেশী বাতাসের চাপ সহ্য করিতে পারে। সাহারা মরুভূমির শুষ্ক তপ্ত বালুকাতেও জীবাণুর অবস্থিতির কথা জানা

গিয়াছে। এই স্থান হইতে সংগৃহীত পনেরো গ্রেণ বালুকাতে অসংখ্য রকমের জীবাণুর অস্তিত্ব দেখা গিয়াছে।

তিন হাজার ফুট গভীর পেট্রোল কূপেও বৈজ্ঞানিকেরা জীবাণুর সন্ধান পাইয়াছেন। তেত্রিশ হাজার ফুট নীচে কয়লাস্তরে জীবাণুর অবস্থিতি দেখা গিয়াছে। যে সকল উষ্ণ প্রস্রবণের তাপমাত্রা ৯২° সেন্টিগ্রেড, সেখানেও জীবাণু বিশেষের অস্তিত্ব দেখা যায়। উচ্চতম পর্বতশিখর ও বরফ শিলাতেও জীবাণুর সন্ধান পাওয়া যায়। মেরুসমুদ্রেও জীবাণুর অবস্থিতির কথা প্রমাণিত হইয়াছে। এক রকম সিলিকন জীবাণু আছে, যাহারা সুকঠিন গ্র্যানিট ও ব্যাসাল্ট পাথরকেও আক্রমণ করিয়া ক্ষয়িত করে।

জীবাণুর জীবন—২৭৩° সেন্টিগ্রেড হইতে + ১৭০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা অবধি সীমাবদ্ধ, আর ইহাদের কোন কোনটির পক্ষে ০ হইতে ৮০০০ পর্যন্ত বায়ুচাপ সহনীয়। এবং ২০° সেন্টিগ্রেড হইতে ৪৭° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার মধ্যে অধিকাংশ জীবাণু উৎকর্ষ লাভ করে।

জীবাণুগুলিকে প্রাথমিক প্রাণী (Protozoa), বীজাণু (Bacteria) ও বিষাণু (Virus)—এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। বলা বাহুল্য, সমস্ত জীবাণুর শরীরই একটি মাত্র কোষে গঠিত। এই সমস্ত এককোষী জীবের আহার-বিহার ও বংশবিস্তারের প্রণালী বিচিত্র। ইহাদের সুনির্দিষ্ট কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাই। ইহারা সমস্ত দেহ প্রাচীরের মধ্য দিয়াই আহার্য ও অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড ও দূষিত পদার্থ বাহির করিয়া দেয়। জীবাণুর শরীর গঠনের জন্য আমাদের মতই চিনি ও ছানাজাতীয় পদার্থ এবং চর্বির প্রয়োজন হয়।

সমস্ত জীবাণুই বংশবিস্তারের সময় নিজের শরীর দ্বিধা বিভক্ত করে। এইরূপ নিজ নিজ দেহ দ্বিখণ্ডিত করিয়া ইহারা নূতন জীবনের সৃষ্টি করে। অনুকূল অবস্থায় প্রাথমিক এককোষী প্রাণীরা প্রতি একঘণ্টা অন্তর দেহ-বিভাগ করে, আর বীজাণুরা আধ ঘণ্টা অন্তর শরীর বিভক্ত করে। বড় বড় এককোষী প্রাণী কয়েক দিন হইতে কয়েক

মাস অন্তর বংশবৃদ্ধি করে। একটি হইতে দুইটি, দুইটি হইতে চারিটি—এইভাবে জ্যামিতিক নিয়মে ইহারা সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়া থাকে। তাপ বা বিষ প্রয়োগ না করিলে ইহাদের স্বাভাবিক মৃত্যু নাই। প্রকৃত পক্ষে ইহারা অমর।

সচরাচর অনুকূল আবেষ্টনীতে একটি বীজাণু প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর দ্বিধা বিভক্ত হয়। সুতরাং ৩০ মিনিটে প্রত্যেকটি বীজাণু ২টি হইয়া যায়, ১ ঘণ্টায় ৪টি, দেড় ঘণ্টায় ৮টি, ২ ঘণ্টায় ১৬, ৩ ঘণ্টায় ৬৪, ৪ ঘণ্টায় ২৫৬, ৫ ঘণ্টায় ১০২৪, ১০ ঘণ্টায় ২২১৪৪ এবং ২০ ঘণ্টায় ১৯১৬৬৭২০০০০০০ হয়, আর তখন সম্মিলিত বীজাণুদের ওজন হইবে প্রায় ১ রতির মত। ৪০ ঘণ্টায় ইহাদের ওজন হইবে ৫০৮৭২৩ মণ। সাধারণতঃ এরূপ সংখ্যা বৃদ্ধি সম্ভব নয়। কারণ শত্রু বৃদ্ধি অথবা খাদ্যের অল্পতা ঘটিলে কিম্বা আবেষ্টনী অতিরিক্ত গরম, ঠাণ্ডা বা শুষ্ক হইয়া গেলে বংশবৃদ্ধি সঙ্গে সঙ্গে স্থগিত হইয়া যায়। ইহা ছাড়া জীবাণুদের দেহনিঃসৃত দূষিত দ্রব্যের পরিমাণ বেশী হইয়া গেলেও বংশবিস্তার আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যায়।

জীবাণুরা যে সর্বদাই দেহ-বিভাগ করে, তাহা নহে, এক এক সময় দুইটি জীবাণু সম্মিলিত হইয়া এককোষ, একদেহ ও একপ্রাণ হইয়া যায়।

সাধারণতঃ অধিকাংশ প্রাথমিক প্রাণীকোষ সচল, আর বীজাণুরা অচল। বীজাণুদের মধ্যে আবার টাইফয়েড ও কলেরার বীজাণু বেশ নড়াচড়া করিতে পারে। জীব-বিজ্ঞানীরা প্রাথমিক জীবকোষকে প্রাণী এবং বীজাণুকে উদ্ভিদ শ্রেণীর মধ্যে গণনা করিয়া থাকেন। বিষাণু বা ভাইরাস যেন জড় ও জীবের মধ্যবর্তী স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রত্যেক প্রাথমিক প্রাণীর কোষকেন্দ্র (Nucleus) আছে, কিন্তু বীজাণু (Bacteria) ও বিষাণুর (Virus) কোন কোষকেন্দ্র নাই।

ডোবার জলে কখনও কখনও প্যারামিসিয়াম নামক বিভিন্ন আকৃতির অনেক রকম এককোষী প্রাণী দেখা যায়। ইহাদের শরীরের

বিস্তার এক ইঞ্চির শতভাগের একভাগেরও কম। যাঁহাদের দৃষ্টিশক্তি খুব প্রখর, তাঁহারা ইহাদের খালি চোখেই দেখিতে পারেন। কিন্তু ১০ + শক্তিবিশিষ্ট বিবর্ধক কাচের সাহায্যে সকলেই ইহাদের প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। একটি পাতলা কাচের উপর এক ফোঁটা পুকুরের জল স্থাপন করিয়া আলোকের সম্মুখে ধরিয়া দশ শক্তিবিশিষ্ট বিবর্ধক কাচ দিয়া পর্যবেক্ষণ করিলে অনেক সময় সচল প্যারামিসিয়াম বা এককোষী প্রাণী সুস্পষ্ট দেখা যায়।

অধিকাংশ এককোষী প্রাণী তাহাদের শরীর সংলগ্ন এক বা একাধিক সূত্রবৎ শোঁয়া নাড়িয়া জলের মধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করে। কোন কোন পুষ্করিণীর স্থির জল অসংখ্য উদ্ভিদাণুর জন্যই সবুজাভ দেখায়। লোহিত সাগরের রং অগণিত জীবাণুর উপস্থিতির জন্যই রক্তাভ। মিশরের পিরামিডসমূহ যে পাথরে তৈয়ারী তাহা অগণিত এককোষী প্রাণীর সিলিকা-নির্মিত দেহাবরণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

পুষ্করিণীর জলে অ্যামিবা নামক এককোষী জীব দেখা যায়। ইহারা পর্যায়ক্রমে নিজেদের শরীর প্রসারিত ও সঙ্কুচিত করিয়া জলের ভিতর ঘুরিয়া বেড়ায়। প্রাথমিক এককোষী প্রাণী এক ইঞ্চির শতভাগের একভাগ হইতে এক ইঞ্চির ১২০০০ ভাগের একভাগ পর্যান্ত বিস্তৃত হয়, আর বীজাণুগুলি $\frac{১}{১২৫০০০}$ ইঞ্চি হইতে আধ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হয়। এক প্রকার নিউমোনিয়ার বীজাণু হইল ক্ষুদ্রতম, আর বৃহত্তম বীজাণু হইল গন্ধক বীজাণু, যাহারা প্রায় এক সেণ্টিমিটার পর্য্যন্ত লম্বা হয়। সে জন্য ইহাদের খালি চোখেও দেখা সম্ভব। বীজাণু তিন রকমের হয়—গোলাকার, দণ্ডাকার ও বক্রাকার। বিষাণু বীজাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ইহাদের দেখা যায় না। ইহাদের পর্যবেক্ষণ করিতে হইলে ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের সাহায্য প্রয়োজন। বিষাণু $\frac{১}{৩১২৫০০০}$ ইঞ্চি হইতে $\frac{১}{১৫৬২৫০}$ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়।

সাধারণ পোর্সিলিনের ফিল্টারের দ্বারা প্রাথমিক জীবকোষ এবং

সমস্ত বীজাণু ছাঁকিয়া লওয়া যায়। কিন্তু বিষাণু এতই ছোট যে, ইহারা চিনামাটির ছাঁকুনির মধ্য দিয়াও যাতায়াত করিতে পারে। বিষাণুর আর একটা বিশেষত্ব এই যে, উহারা জ্যামিতিক আকারে দানা বাঁধিতে পারে। জীবন্ত জীবকোষ ব্যতীত অন্য কোন মাধ্যমে বিষাণু বংশবিস্তার করিতে পারে না। সেই জন্য ইহারা ডিমের কুসুম, সজীব প্রাণী ও উদ্ভিদ-শরীরেই কেবল বর্ধিত হয়। অন্যদিকে আদিম প্রাণীকোষ ও প্রায় সমস্ত বীজাণুই মাংসরস ও অ্যাগার অ্যাগার নামক সামুদ্রিক উদ্ভিদ-নির্যাস এবং অন্যান্য রাসায়নিক মাধ্যমে সহজেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

ঈষ্টের একটা বিশেষত্ব এই যে, উহারা অক্সিজেন ব্যতিরেকেও জীবনধারণ করিতে পারে। বটুলিনাস বীজাণু (Botulinus) ও ধনুষ্টঙ্কারের (Tetanus) জীবাণুরও এই ক্ষমতা আছে। নিষ্ক্রিয় বীজ (Spores) অবস্থায় জীবাণু তিন বৎসর পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারে।—১৯০° সেন্টিগ্রেড ঠাণ্ডা তরল বায়ুর মধ্যে নিমজ্জিত রাখা সত্ত্বেও কোন কোন জীবাণু-বীজকে ছয় মাস পর্যন্ত সজীব থাকিতে দেখা গিয়েছে। তবে সাধারণতঃ সম্মিলিতভাবে আধ ঘণ্টাকাল ১২০° সেন্টিগ্রেড তাপ ও বাষ্পের চাপ প্রয়োগ করিলে সমস্ত জীবাণুই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। জীবাণু ধ্বংসের কাজে সচরাচর ক্লোরিনযুক্ত চুন, কার্বলিক অ্যাসিড ও পটাসিয়াম পার্মাঙ্গানেট ব্যবহৃত হয়।

এখন সকলেই জানেন—খাদ্য, পানীয় বা বাতাসের সহিত কিংবা জীবজন্তুর সাহায্যে শরীরে সংক্রামক ব্যাধির জীবাণু প্রবেশ করিলে নানারকম রোগ হইতে পারে। যেমন—ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, নিদ্রারোগ এবং রক্ত-অতিসার প্রাথমিক প্রাণীকোষ কর্তৃক সৃষ্ট হয়। আর কলেরা, কুষ্ঠ, প্লেগ ও যক্ষ্মা ইত্যাদি বীজাণু সঞ্চারের জন্য উৎপন্ন হয়। বসন্ত, হাম, গলস্ফীতি, পীতজ্বর, পলিও, জলাতঙ্ক ও সর্দিজ্বর ইত্যাদি বিষাণু সংক্রমণের জন্য সংঘটিত হয়।

কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত সংক্রামক রোগের আসল কারণ অধিকাংশ লোকেরই অজ্ঞাত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও হেসারের

মত বিজ্ঞানী বিশ্বাস করিতেন যে, মহামারীর হেতু সূর্যগ্রহণ, ধূমকেতু, ভূমিকম্প, বন্যা বা অগ্ন্যুৎপাত। তবে খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে থিউসাইডাইড নামক গ্রীক মনীষী আন্দাজে বলেন—প্লেগ ব্যাধি খুব সম্ভব সজীব সংক্রমণের জন্যই (Contagium Virum) হয়। রোমান ঋষি ভারো খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে মনে করিতেন, ম্যালেরিয়া জ্বর একরকম অতিক্ষুদ্র অদৃশ্য জীবাণু কর্তৃক মানবদেহে সঞ্চারিত হয়।

যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ রোগ-বীজাণু আবিষ্কার করা সম্ভব হয়। নীচে কয়েক জাতীয় জীবাণু আবিষ্কারের নাম দেওয়া হইল।

প্লেগ	১৮৯৪	ইয়ারসেন
কলেরা	১৮৮৩	কক্
বসন্ত		প্যাশ্চেন
যক্ষ্মা	১৮৮২	কক্
কুষ্ঠ	১৮৭১	হ্যানসেন
সিফিলিস	১৯০৫	শডিন
ম্যালেরিয়া	১৮৮০	ল্যাভেরান
রক্তদুষ্টি	১৮৮০	পাস্তুর
ডিপাথিরিয়া	১৮৮৪	ক্লিবস ও লোয়েফ্লার

মহামারীর প্রকোপে কেমন করিয়া ব্যাপকভাবে প্রাণহানি ঘটে বঙ্কিমচন্দ্র ১১৭৬ সালের মন্বন্তর উপলক্ষ্য করিয়া তাহার এক ভয়াবহ চিত্র আনন্দমঠে অঙ্কিত করিয়াছেন।

চতুর্দশ শতাব্দীতে ব্ল্যাকডেথ নামক ভয়াবহ প্লেগব্যাধি প্রথমে চীনদেশে আরম্ভ হইয়া ঐ অঞ্চলের সাড়ে তিন কোটি লোক নিঃশেষ করে। তাহার পর এই ব্যাধি সমগ্র ইউরোপে পরিব্যাপ্ত হয় এবং ইহার কবলে পড়িয়া প্রায় আড়াই কোটি লোক নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর যে সংক্রামক সর্দিজ্বর (Influenza) সমস্ত পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়ে, তাহাতে মৃত্যুর হার চারি বৎসরে যুদ্ধে নিহত সৈন্য-সংখ্যা অপেক্ষাও অনেক অধিক হইয়াছিল। কেবল লণ্ডন

সহরেই এই জ্বরে ১৮০০০ লোকের জীবনান্ত হয়, আর এই দেশে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ৬০ লক্ষ।

প্রায় এক দশক পূর্বেও ভারতে সংক্রামক ব্যাধিতে মৃত্যুর সংখ্যা এইরূপ ছিল—

ম্যালেরিয়া	১২৫০০০০
যক্ষ্মা	৫০০০০০
বসন্ত	৭০০০০
কলেরা	৫০০০০
প্লেগ	২০০০০

বিভিন্ন জাতীয় জীবজন্তু বিভিন্ন জীবাণু কর্তৃক সমানভাবে প্রভাবিত হয় না। যেমন—কুষ্ঠ-ব্যাধি মানুষ ছাড়া অন্য কোন ইতর প্রাণীর মধ্যে সংক্রমণ করা যায় না। অপর দিকে, অ্যানথ্রাক্স রোগ গরু, ঘোড়া ও ভেড়া প্রভৃতি পশুদের গুরুতর রকমই হয়, কিন্তু কুকুর, ইঁদুর ও মুরগীর মোটেই হয় না। বসন্ত ও যক্ষ্মা আবার গরু ও মানুষ উভয়েরই হয়। জীবাণুর জোর এক প্রাণী হইতে অন্য প্রাণীতে সংক্রমণের সময় কিম্বা পরিবেশ পরিবর্তনের ফলে কম-বেশী হইতে পারে। জীবাণু যে শুধু মানুষের মধ্যেই রোগ সঞ্চার করে তাহাই নয়, উহারা অনেক সময় চাষের ফসল ও শাকসব্জীর প্রচুর অনিষ্ট সাধন করে।

আমাদের শরীরে জীবাণু জয় করিবার দুই রকম ব্যবস্থা আছে। রক্তরসের মধ্যে যে শ্বেত কণিকা থাকে, তাহারা বিজাতীয় কোন জীবাণু দেহে প্রবেশ করিলেই উদরসাৎ করিয়া ফেলে। ইহা ছাড়া বিজাতীয় বীজাণুর আক্রমণ ঘটিলেই, শরীরে এমন একরকম বিষ-বিধ্বংসী পদার্থ উৎপন্ন হয়, যাহা জীবাণু ও তাহাদের দেহ-নিঃসৃত বিষ একযোগে বিনষ্ট করে।

ভিন্ন ভিন্ন ব্যাধির মৃত কিম্বা নির্বীর্য জীবাণু অথবা তাহাদের দেহ-নিঃসৃত বিষ সামান্য পরিমাণে টিকা রূপে শরীরে গ্রহণ করিয়া আমরা বিশেষ বিশেষ রোগ প্রতিরোধ করিয়া থাকি। ১৭৯৬ সালে সুবিখ্যাত

ইংরেজ চিকিৎসক এডওয়ার্ড জেনার সর্বপ্রথম টিকা দিবার বৈজ্ঞানিক প্রণালী উদ্ভাবন করেন। ১৮৮৫ সালে ফ্রান্সের বৈজ্ঞানিক লুই পাস্তুর জলাতঙ্ক রোগ প্রতিরোধ করিবার অভিনব উপায় আবিষ্কার করেন। তিনি দেখিলেন, ক্ষিপ্ত কুকুরদষ্ট ব্যক্তির দেহে জলাতঙ্ক ব্যাধির নির্বীর্য বিষাণু পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিলে রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতা জন্মায় এবং রোগীও রক্ষা পায়।

শত বৎসর পূর্বে কোন অস্ত্রোপচার হইলেই জীবাণু সংক্রমণের জন্য প্রায়ই ক্ষত দূষিত হইয়া শতকরা ৪৫ জনের প্রাণহানি ঘটিত। ১৮৬৭ সাল হইতে বিখ্যাত ইংরেজ অস্ত্রচিকিৎসক লর্ড লিষ্টার অস্ত্রচিকিৎসার সময় কার্বলিক অ্যাসিড দিয়া যন্ত্রপাতি ও রোগীর ক্ষত বিশোধন করিবার প্রথা প্রচলন করেন। ইহার ফলে তখনই মৃত্যুর হার কমিয়া গিয়া মাত্র ১৫%-এ দাঁড়ায়। লিষ্টারের প্রায় কুড়ি বৎসর আগেই হাঙ্গেরীর ডাক্তার সেমেলওয়েজ (১৮১৮-'৬৫) ধাত্রীবিদ্যা-সংক্রান্ত কার্যে বিশোধনের জন্য জলের সহিত ক্লোরিনযুক্ত চুন ব্যবহার করিয়া বিশেষ সুফল পাইয়াছিলেন।

স্বাভাবিক অবস্থায় বিভিন্ন জাতীয় জীবাণু পরস্পরের সহিত সংগ্রাম করিয়া প্রায়ই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। লুই পাস্তুর প্রথম লক্ষ্য করেন যে, অ্যানথ্রাক্স জীবাণু সাধারণতঃ মাংসের সুরুরায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু যদি কোনক্রমে উহার মধ্যে গলনজীবাণু প্রবেশলাভ করে, তাহা হইলে তাহারা অতি দ্রুত বংশবৃদ্ধি করিয়া পূর্বোক্ত অ্যানথ্রাক্স জীবাণুগুলিকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত ও নির্জীব করে। তাহার পর মেচ্‌নিকফ আবার প্রমাণ করেন যে, দধির বীজাণু অনায়াসে গলনজীবীদের বংশবিস্তার নিবারণ করিতে পারে। আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং ১৯২৮ সালে প্রথম পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, পেনিসিলিয়াম ছত্রাকাণু এইভাবেই অনেক প্রকার রোগ-বীজাণুর অগ্রগতি প্রতিরোধ করিয়া থাকে।

ঈষৎ আর্দ্র ও উষ্ণ আবহাওয়ায় খাদ্যদ্রব্য যে সহজেই পচিয়া নষ্ট হয়, তাহার কারণও জীবাণুর ক্রিয়া। আহার্য দ্রব্য রেফ্রিজারেটরে হিমশীতল অবস্থায় রক্ষা করিতে পারিলে অনেক দিন পর্যন্ত অবিকৃত

থাকে। মাছ ও মাংস লবণাক্ত করিয়া রাখিলেও কিছুদিন থাকে। ইহা ছাড়া দুধ, ফল, মাছ বা মাংস টিনের কৌটায় ভরিয়া উহার মুখ রাং-ঝাল দিয়া বন্ধ করিবার পূর্বে ২৩০° ফারেনহাইট উত্তাপ প্রয়োগ করিলে খাদ্যের মধ্যস্থিত জীবাণুগুলি মরিয়া যায় এবং ঐ সকল দ্রব্য অনেক দিন অবধি টাটকা থাকে।

জীবাণু যে কেবল আমাদের অপকারই করে তাহা নহে, কতকগুলি জীবাণু আমাদের জীবনযাত্রার পক্ষে অপরিহার্য। যেমন—ঈষ্ট (Yeast)। আঙুরের রস, মধু কিম্বা গুড়ে জল মিশাইয়া উহাতে খামি বা ঈষ্ট দিলে কিছুকাল পরে সমস্ত দ্রব্যটি গাঁজিয়া মদ্য উৎপন্ন করে। এইরূপে ঈষদুষ্ণ দুগ্ধে দম্বল বা দই-উৎপাদক বীজাণু নিক্ষেপ করিলে কয়েক ঘণ্টা পরে ঐ দুধ দইয়ে পরিণত হয়। শির্কা বা ভিনিগার প্রস্তুত করিতে হইলেও জীবাণুর সাহায্য লইতে হয়। মদ্যে শির্কাবীজাণু নিক্ষেপ করিলে কিয়ৎকাল পরে ঐ মদ অম্লরসে পরিণত হয়। পাঁউরুটি তৈয়ারী করিতে গেলেও খামি বা ঈষ্টের প্রয়োজন। মাখা আটা বা ময়দার মধ্যে ঈষ্ট দিলে অঙ্গারাম্ল গ্যাস উৎপন্ন হয়, আর সমস্ত জিনিষটা ফাঁপিয়া ফুলিয়া ছিদ্রবহুল হইয়া যায়। ইহার পর পাঁউরুটি অগ্নির তাপে সেঁকা হয়।

মটরশুঁটি ও শিম গাছের শিকড়ে একপ্রকার অতি ক্ষুদ্র জীবাণু বাসা বাঁধে। ইহারা সোজাসুজি বাতাস হইতে নাইট্রোজেন গ্যাস গ্রহণ করিয়া জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। মানব-সভ্যতার প্রারম্ভ হইতেই দধিবীজ, শির্কাণু ও ঈষ্ট প্রভৃতি উপকারী জীবাণুগুলিকে সযত্নে নির্বাচন ও প্রতিপালন করা হইয়াছে।

সজীব শরীর সহজেই জীবাণুর প্রভাব প্রতিহত করে, কিন্তু কোন জীব মরিয়া গেলেই অগণিত গলনজীবাণুর আক্রমণে মৃতদেহ বিকৃত ও বিগলিত হইয়া পুনর্বার জল, বায়ু ও মাটির সঙ্গে মিশিয়া যায়। সুতরাং নূতন প্রাণী ও উদ্ভিদ তাহাদের শরীর গঠনের সকল উপাদান আবার সহজেই সংগ্রহ করিয়া লইতে পারে। প্রকৃতির রাজ্যে কণামাত্র বস্তুও বিনষ্ট হয় না।

পুরীর সমুদ্রজল অন্ধকার রাত্রিতে আলোক উদ্ভাসিত দেখিয়া অনেকেই হয়তো বিস্মিত হইয়াছেন। সমুদ্রজলের আলো বিকিরণের কারণ, নক্‌টিলুকা মিলিয়ারিস নামক আলোক-বিকিরণকারী অসংখ্য জীবাণুর অস্তিত্ব।

পচনশীল খড় ও ঘাসপাতার স্তূপে বিনা কারণে কখনও কখনও আপনা হইতেই হঠাৎ আগুন লাগিয়া যাইতে দেখা যায়। ইহার হেতু, তাপ উৎপাদক জীবাণুর ক্রিয়াশীলতা।

এক রকম বীজাণু গন্ধকঘটিত হাইড্রোজেন গ্যাসকে বিশ্লিষ্ট করিয়া প্রাণধারণ করে। সাধারণতঃ লবণাক্ত পদার্থে কোন জীবাণু জন্মায় না, কিন্তু এমন এক জাতীয় রক্তাভ বীজাণু আছে, যাহারা লবণের দানার উপরেও বাসা বাঁধিতে পারে। মোম ও ন্যাপথালিন ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে, পৃথিবীতে এরূপ জীবাণুরও অস্তিত্ব আছে।

জলের কলের লোহার নলে কখনও কখনও এক রকম লৌহ-জীবাণু উৎপন্ন হয়। ইহারা লৌহ অক্সাইড উৎপাদন করিয়া এক এক সময় সমস্ত নলের মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। ইঁটের বাড়ী এবং সিমেন্ট-লৌহ ও প্রস্তরখণ্ডের সমন্বয়ে নির্মিত সৌধও জীবাণুর আক্রমণ হইতে নিস্তার পায় না। গন্ধক-জীবাণু ও নাইট্রোজেন-জীবাণু যথাক্রমে সালফিউরিক অ্যাসিড ও নাইট্রিক অ্যাসিড সৃষ্টি করিয়া কালক্রমে বাড়ীর শক্ত দেয়াল ও কঠিন কংক্রিটও বিনষ্ট করিয়া ফেলে।

আর্দ্র আবহাওয়ায় কখনও কখনও রুটির গায়ে রক্তবিন্দুর মত এক রকম লাল রঙের দাগ ধরিতে দেখা যায়। মধ্যযুগে ইউরোপের কুসংস্কারাপন্ন লোকেরা ইহাকে অলৌকিক কোন ব্যাপার মনে করিয়া অত্যন্ত আতঙ্কিত হইত। বলা বাহুল্য ইহার হেতুও রক্তবর্ণোৎপাদক এক রকম বীজাণু। আমাদের দেশে বাটনা বাটিবার শিলেও সময় সময় একপ্রকার ছত্রাকাণু জন্মিয়া লোকের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করে।

টাস্‌কানির উষ্ণ প্রস্রবণে একজাতীয় বোরেসিক বীজাণু আছে, যাহারা ১০% সালফিউরিক অ্যাসিড দ্রবে স্বচ্ছন্দে বাঁচিয়া থাকে। সমুদ্রের মধ্যে এমন জীবাণুও আছে, যাহারা জাহাজ হইতে পতিত খনিজ তৈলাদি ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করে। এমন এক শ্রেণীর জীবাণুর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, যাহারা অঙ্গারের সহিত বায়ুর অক্সিজেন সম্মিলিত করিয়া উহাকে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসে পরিণত করে। সেই জন্য বনে-জঙ্গলে নির্বাপিত অগ্নির অঙ্গারবিশেষ ক্রমশঃ বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়।

এই জগতেই যে কেবল জীবাণুর অস্তিত্ব আছে তাহাই নয়, জ্যোতির্বিদেরা মঙ্গল ও শুক্রগ্রহের বর্ণালী বিশ্লেষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এই দুইটি গ্রহে উদ্ভিদ ও জীবাণুর অবস্থিতির খুবই সম্ভাবনা রহিয়াছে।

পতঙ্গ প্রসঙ্গ

পৃথিবীতে প্রায় দশ লক্ষের মত বিভিন্ন জাতীয় পতঙ্গ আছে। বাস্তবিক এত রকম বিভিন্ন প্রাণী অন্য কোন জাতীয় জীবের মধ্যে দেখা যায় না। প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ কোটি বৎসর ধরিয়া ক্রমবিবর্তনের ফলে পৃথিবীতে পতঙ্গের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। এখনও ভূস্তরে, কখনও কখনও তৈল-স্ফটিকের (Amber) মধ্যে আবদ্ধ পতঙ্গের জীবাশ্ম পাওয়া যায়। সর্বাপেক্ষা বৃহৎ পতঙ্গ হইতেছে একরকমের গুবরে-পোকা—ইংরেজী নাম গোলিয়াথ বিটল। ইহারা লম্বায় প্রায় ছয় ইঞ্চি, ওজন প্রায় এক ছটাক। ভারতবর্ষের অ্যাটলাস মথ নামক প্রজাপতি জাতীয় পতঙ্গ প্রায় সমান বড়, ইহাদের ডানার বিস্তার বারো ইঞ্চি। আবার অন্যদিকে ক্ষুদ্রতম ষট্‌পদী কীট হইল এক শ্রেণীর গুবরেপোকা, আর এক রকম খুব ছোট বোলতা, যাহার নাম Chalcid Wasp। ইহাদের ওজন এক গ্রেনের সাত হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র। ইহাদের দেহের বিস্তার এক ইঞ্চির একশত পঁচিশ ভাগ অপেক্ষাও কিছু কম।

পতঙ্গ জাতীয় প্রাণীগুলিকে আট ভাগে ভাগ করা যায়। রূপালী কীট, আরশোলা, ফড়িং, ছারপোকা, গুবরেপোকা, মশা, প্রজাপতি ও মৌমাছি প্রভৃতি লক্ষ্য করিলে প্রত্যেক শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য পরিষ্কার বুঝা যাইতে পারে।

পতঙ্গেরা মোটেই ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না। সেই জন্য মেরু প্রদেশ ও উচ্চ পর্বতশৃঙ্গে পতঙ্গের সংখ্যা যৎসামান্য। উষ্ণ মণ্ডলেই সর্বাধিক পতঙ্গ দেখা যায়। সমুদ্রের লবণাক্ত জলে কোন পতঙ্গের বাস নাই, কেবল একটি মাত্র সামুদ্রিক মক্ষিকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। নদী ও পুষ্করিণীর জলে অনেক প্রকার ফড়িং ও মশা শৈশবকাল অতিবাহিত করে। কিন্তু এক জাতীয় জলচর গুবরেপোকা

আছে, যাহারা চিরকাল জলের মধ্যেই থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় কালিফোর্ণিয়ায় গভীর পেট্রোলিয়াম কূপের মধ্যে সিলোপা নামে একরকমের মাছি জীবন্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে।

প্রত্যেক পতঙ্গের প্রধান বিশেষত্ব হইল ছয়টি যুক্তপদ ও কঠিন আবরণবিশিষ্ট খণ্ডে বিভক্ত দেহ। এই আবরণকে চিটিন বলে। ইহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এই আবরণের মধ্যে সুরক্ষিত থাকে। পতঙ্গদের শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া অদ্ভুতভাবে সম্পাদিত হয়। যাবতীয় পতঙ্গের শরীরই ছিদ্রবহুল। এই সকল ছিদ্রের সহিত বহু সংখ্যক বায়ুনালী সংযুক্ত আছে। পতঙ্গেরা সমস্ত শরীর অনবরত সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করিয়া এই সব ছিদ্র দিয়া অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড বাহির করিয়া দেয় ইাহাদের হৃদ্‌যন্ত্র পিঠের ঠিক নীচে অবস্থিত, আর স্নায়ুতন্ত্র থাকে পেটের নীচে লম্বালম্বিভাবে। ইহাদের রক্তের রং সাধারণত নীলবর্ণের হইয়া থাকে। আমাদের মতই পতঙ্গদেরও মুখ, অন্ননালী, পাকস্থলী ও অন্ত্র আছে। পাচক রস সরবরাহের জন্য ইহাদের একটি গ্রন্থি আছে, উহাকে সচরাচর যকৃৎ বলা হয়। ঘ্রাণ নেওয়া ও অনুভূতির জন্য প্রত্যেক পতঙ্গের মস্তকে দুইটি করিয়া শোঁয়া বা শুঁড় থাকে। পিপীলিকারা এই শোঁয়ার সাহায্যে পরস্পরের সহিত ভাবের আদান-প্রদান করে।

পতঙ্গের চোখ আশ্চর্যজনক। ইহাদের চোখ বহুসংখ্যক লেন্সের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চোখের সমষ্টি মাত্র। প্রত্যেক চোখের দ্বারা গৃহীত খণ্ড খণ্ড প্রতিচ্ছবি একত্র হইয়া ইহাদের দৃষ্টিজ্ঞান জন্মায়। এরূপ চোখকে যৌগিক চোখ বলা হয়। মৌমাছি, পিপীলিকা, উইপোকা প্রভৃতি সামাজিক কীটপতঙ্গের মধ্যে দেখা যায়, স্ত্রী-পতঙ্গ নিষিক্ত ডিম্ব হইতে, আর পুরুষ পতঙ্গ অনিষিক্ত ডিম্ব হইতে উৎপন্ন হয়। জীব-জগতে ইহা এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম।

পতঙ্গদের জীবনে চার রকমের অবস্থা আসে, যথা—ডিম্বাবস্থা, কীটাবস্থা, পুত্তলী অবস্থা আর পূর্ণাঙ্গ অবস্থা। প্রথমে ডিম ফুটিয়া কীট বা কীড়া বাহির হয়। কিছুদিন পরে এই কীট নিজের শরীরের

চতুর্দিকে এক রকম আবরণ বা গুটি প্রস্তুত করিয়া উহার মধ্যে সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করে। ইহাকে পুত্তলী অবস্থা বলে। এই সময় কীটের শরীরে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয়। আবার কিছুদিন পরে গুটির আবরণ ভেদ করিয়া পতঙ্গ বাহির হইয়া আসে।

অধিকাংশ পতঙ্গের পূর্ণবয়স্ক অবস্থা কয়েক ঘণ্টা হইতে কয়েক মাস পর্যন্ত স্থায়ী হইয়া থাকে। সাধারণ কর্মী-মৌমাছির আয়ু বড়জোর দুই মাস। রাণী-মক্ষিকা পাঁচ বৎসর পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। কোন কোন রাণী-পিপীলিকাকে নাকি সতেরো বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকিতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু বেশীর ভাগ প্রজাপতির জীবনকাল এক বছরের বেশী নয়। কোন কোন পতঙ্গের পা কিংবা শোঁয়া ভগ্ন বা ছিন্ন হইলে আবার গজাইয়া উঠিতে দেখা যায়।

মধুমক্ষিকার বর্ণজ্ঞান আছে কি না, তাহা পর্যবেক্ষণ করা হইয়াছে। বাগানে একটি টেবিল লইয়া গিয়া তাহার উপর একটি নীল রঙের কার্ড স্থাপন করা হয়। কার্ডবোর্ডের উপর একটি কাচের পাত্র রাখিয়া তাহাতে কয়েক ফোঁটা মিষ্টি সরবত ঢালিয়া দিলে কিছুক্ষণ পরেই মৌমাছিরা সেখানে আসিয়া ঐ সরবত আহরণ করিয়া চাকে লইয়া যাইতে আরম্ভ করে। অল্পক্ষণ এইভাবে চলিবার পর, মৌমাছিরা যখন এই কার্যে সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হইয়া যায়, তখন নীল কার্ডের চারি-পাশে আরও কতকগুলি কালো, সাদা ও ধূসর বর্ণের কার্ড স্থাপন করিয়া প্রত্যেকের উপরই ঐরূপ এক একটি খালি কাচ পাত্র বসাইয়া দেওয়া হয়। মৌমাছিরা কিন্তু নীল কার্ডের কাছেই উড়িয়া আসে। এই প্রণালীতে বিভিন্ন বর্ণের কার্ড লইয়া পরীক্ষা করিলে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, মধুমক্ষিকারা সকল রং-ই চিনিতে পারে ; কেবল লাল রঙের বেলায় দেখা গিয়াছে যে, ইহারা ঐ রঙের সঙ্গে কালো রঙের গোলমাল করিয়া ফেলে। সুতরাং মৌমাছিদের কেবল রক্ত-বর্ণান্ধ বলা চলে।

প্রজাপতিরা কিন্তু নীল ও পীত বর্ণ ব্যতীত আর কোন রং-ই চিনিতে পারে না। অন্য সকল বর্ণ ই ইহাদের নিকট গাঢ় ধূসর বলিয়া

প্রতীয়মান হয়। সকলেই জানেন, অতিবেগুনী রশ্মি মানবচক্ষুর অগোচর। কিন্তু মৌমাছি ও প্রজাপতি যে তাহাদের যৌগিক চক্ষু দিয়া এই অদৃশ্য অতিবেগুনী আলোও দেখিতে পায়, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

ডানা কাঁপাইয়া কিংবা পা ঘষিয়া কীট-পতঙ্গেরা শব্দ উৎপাদন করে। ইহাদের যখন শব্দ করিবার ক্ষমতা আছে, তখন শ্রবণ করিবারও কোন না কোন ব্যবস্থা থাকা আশ্চর্য নয়! উত্তমরূপে পরীক্ষা করিলে পতঙ্গবিশেষের সম্মুখের পদদ্বয় কিংবা উদরে শ্রুতিযন্ত্রের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়।

এক জাতীয় পুরুষ প্রজাপতির ঘ্রাণেন্দ্রিয় এত সূক্ষ্মানুভূতিসম্পন্ন যে, এক মাইল দূর হইতে ইহারা স্ত্রী-প্রজাপতির উপস্থিতি জানিতে পারিয়া উহার নিকট উড়িয়া আসে। পিপীলিকা ও মৌমাছির গোষ্ঠীগত পরিচয় গন্ধের উপর নির্ভর করে। বিজাতীয় পতঙ্গের গায়েও যদি কোনক্রমে বাসার গন্ধ লাগিয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা বন্ধুর মত ব্যবহার পায়। কিন্তু গন্ধ অন্য প্রকার হইলেই যে কোন আগন্তুক অবিলম্বে নিহত হয়।

পতঙ্গদের বুদ্ধির বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহারা প্রধানতঃ সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারাই পরিচালিত হয়। কিন্তু মৌমাছি, পিপীলিকা ও উইপোকার সমাজ-জীবন খুব সুন্দর ও সুগঠিত। ইহাদের শ্রম ও কর্মবিভাগ দেখিবার মত।

এইবার মৌমাছির জীবন-কথা আলোচনা করা যাউক। প্রত্যেক মধুচক্রে একটি রাণী-মক্ষিকা, কয়েক হাজার কর্মী-মক্ষিকা এবং কয়েক শত পুরুষ মক্ষিকা থাকে। সমস্ত জীবনের মধ্যে রাণী-মক্ষিকা একবার মাত্র পুরুষ মক্ষিকার সহিত আকাশে উড়িয়া গিয়া মিলিত হয়। কর্মী-মৌমাছি বন্ধ্যা স্ত্রী-মক্ষিকা ছাড়া আর কিছুই নয়। কোন বাচ্চাকে প্রচুর পরিমাণে পরাগ ও মধু খাওয়ান হইলে উহা রাণী-মক্ষিকায় পরিণত হয়। পুরুষ মৌমাছিরা বড় অলস, তাহারা কোন কাজ করে না। কর্মী-মক্ষিকা পূর্ণ গঠিত হইয়াই প্রথমে স্বীয় কক্ষ পরিষ্কার করিয়া

ফেলে। ইহার তিন দিন পরে সে অন্যান্য বাচ্চাগুলিকে আহার প্রদান করিতে আরম্ভ করে। অতঃপর কর্মী-মক্ষিকা চক্রে প্রত্যাগত বয়স্ক মক্ষিকার মুখ হইতে পুষ্পরস গ্রহণ করিয়া উদরস্থ করিয়া ফেলে। পাকস্থলীর ভিতর যখন ঐ পুষ্পরস মধুতে রূপান্তরিত হইয়া যায়, তখন সে উহা উদ্গীরণ করিয়া চাকের নির্দিষ্ট ভাণ্ডারে সঞ্চিত করিয়া রাখে। ইহার দুই-একদিন পরেই সে চাক পরিষ্কার রাখিবার ভার লয়। তারপর কর্মী-মক্ষিকা নিজ দেহ হইতে মোম উৎপাদন করিয়া নূতন নূতন কোষ নির্মাণ করিতে থাকে। আরও কিছুদিন পরে সে দ্বাররক্ষকের কার্যে নিযুক্ত হয়। চাকে বিজাতীয় কোন মৌমাছি প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলে তাহাকে হুল ফুটাইয়া নিরস্ত করিয়া দেয়। অবশেষে প্রায় দিন কুড়ি পর সে পুষ্পরস ও পরাগ সংগ্রহার্থে বাসা হইতে বহির্গত হয়। কর্মী-মক্ষিকা মধুপূর্ণ নূতন ফুলের খোঁজ পাইলে বাসায় ফিরিয়া বিশেষ ধরণের একপ্রকার নৃত্য আরম্ভ করিয়া দেয়। ইহাতে তাহার সহকর্মীরা বুঝিতে পারে যে, কাছাকাছি কোথাও মধুর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং তাহারা তৎক্ষণাৎ দলবদ্ধ হইয়া সেই মধুর অন্বেষণে বহির্গত হয়। এই সকল কাজ করিতে কর্মী-মক্ষিকার কোন শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। আপনা হইতেই সে এই সকল জটিল কার্য সম্পন্ন করে।

উইপোকা সর্বদা আলোক এড়াইয়া চলে। কাঠের উপাদান ইহাদের প্রধান খাদ্য। উইপোকার অন্ত্রে একরকম জীবাণু থাকে, তাহাদের সাহায্যেই উইপোকা কঠিন কাঠ জীর্ণ করে। উইপোকারা মৃত্তিকার মধ্যে অন্ধকার গর্তে বাস করে। কর্মী-উইপোকা ও পিপীলিকার ডানা নাই, কিন্তু সমস্ত রাণী ও পুরুষ উইপোকা ও পিপীলিকার ডানা আছে।

কয়েক জাতীয় পিপীলিকার ভিতর সহজাত প্রবৃত্তির ক্রিয়া আরও আশ্চর্যজনক প্রতীয়মান হয়। এক শ্রেণীর পিপীলিকা তাহাদের বাসস্থানের মধ্যে একরকম ছত্রাক রোপন করে। এই ছত্রাক তাহারা আহার্য হিসেবে গ্রহণ করে। আমরা যেমন দুধের জন্য গরু প্রতিপালন

করি, কয়েক জাতীয় পিপীলিকা সেই রকম মিষ্টরস প্রদানকারী বিভিন্ন প্রকার কীট পালন করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত একপ্রকার সৈনিক পিপীলিকা দৃষ্ট হয়। ইহারা বিজাতীয় পিপীলিকার বাসভূমি আক্রমণ করিয়া সেখান হইতে বহুসংখ্যক ক্রীতদাস সংগ্রহ করিয়া আনে এবং তাহাদের দ্বারা গৃহ-নির্মান, সন্তান পালন, খাদ্যসংগ্রহ প্রভৃতি যাবতীয় কাজ করাইয়া লয়।

গাছের ডালে পাতার মধ্যে লালপিপীলিকার বাসা অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। এই জাতীয় পিপীলিকা পাতার সহিত পাতা জুড়িয়া বাসা প্রস্তুত করে। যদি পাতার বাসা কোন রকমে ছিঁড়িয়া যায়, তাহা হইলে পিপীলিকারা তৎক্ষণাৎ তাহা মেরামত করিবার জন্য ব্যস্ত হয়। একদল পিপীলিকা পাতার কিনারা এক সঙ্গে টানিয়া ধরে, আর অন্যদল ছোট ছোট বাচ্চা মুখে করিয়া পাতার ধারগুলি তাহাদের লালার সাহায্যে জুড়িয়া দেয়। বাচ্চাদের লালা নিঃসরণ করিতে বাধ্য করা হয়।

পিপীলিকারা নিজেদের বাসস্থান ও তৎসংলগ্ন গোলকধাঁধার রাস্তাঘাটগুলি ভাল করিয়া চিনিয়া রাখিতে পারে। মৌমাছিও চাকের চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রায় এক ক্রোশ জায়গা চিনিয়া ফেলে এবং সেই জন্য খাদ্য সংগ্রহের পর গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে ইহাদের কোন অসুবিধা হয় না। আরও দেখা গিয়াছে, নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময় দিন কয়েক নিয়মিতভাবে মিষ্টরস প্রদান করিলে মৌমাছিরা ঠিক সেই স্থানে সেই সময়ে উপস্থিত হইতে সক্ষম হয়।

কোন কোন জাতীয় মাংসাশী পুরুষ মক্ষিকা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ ধরিয়া স্বীয় দেহনিঃসৃত বুদ্বুদের সহিত আটকাইয়া স্ত্রী-মক্ষিকাকে উপহার প্রদান করে। কখনও কখনও কীটের পরিবর্তে ফুলের পাপড়ি কিম্বা ঘাসের শীষ বুদ্বুদের সহিত সংলগ্ন করিয়াও সঙ্গিনীকে উপহার দেয়। অনুরাগ প্রদর্শনকালে মক্ষিকার এইরূপ সৌন্দর্যবোধের পরিচয় সত্যই বিস্ময়কর।

একপ্রকার বোলতার জীবনেতিহাস বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক।

সন্তান জন্মের পূর্বে ইহারা মাটি দিয়া কিম্বা উদ্ভিজ্জ বস্তু চিবাইয়া একরকম বাসা প্রস্তুত করিয়া রাখে। তাহার পর কোন কীট ধরিয়া আনে, কিন্তু তাহাকে প্রাণে মারে না, কেবল উহার স্নায়ুকোষে হুল ফুটাইয়া অবশ করিয়া দেয়। এই অসাড় অথচ সজীব কীটকে বাসার মধ্যে আনিয়া রাখে এবং উহার উপর ডিম পাড়িয়া গর্তের মুখ বন্ধ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। যথা সময়ে ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হয় এবং ঐ বন্দী কীট উদরসাৎ করিয়া ক্রমশঃ বড় হইতে থাকে। বোলতারা কখনও মৃত কীট বাচ্চার খাবার জন্য সংগ্রহ করে না, কারণ মৃত কীটের দেহ সহজেই বিকৃত হইয়া যায়। ইহাদের সহজ জ্ঞান বিস্ময়কর।

ভারতবর্ষে বনে-জঙ্গলে একরকম কাঠিপোকা দেখা যায়। রাত্রির অন্ধকারে ইহারা বেশ চলাফেরা করে, কিন্তু উহাদের উপর কোন তীব্র আলো পড়িলেই কাঠের মত স্থির ও শক্ত হইয়া যায়। কাঠিপোকার এই অবস্থাকে সম্মোহিত অবস্থার সহিত তুলনা করা চলে।

জোনাকি-পোকার পুচ্ছ হইতে কিরূপ স্নিগ্ধ নীলাভ আলোক বিকিরিত হয়, তাহা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। জোনাকি ইচ্ছামত এই আলো জ্বালাইতে ও নিবাইতে পারে। জোনাকির আলো মিলন সঙ্কেত ছাড়া আর কিছুই নয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতে, একরকম রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার ফলে জোনাকির পুচ্ছভাগ হইতে এই তাপহীন আলো বিকিরিত হয়।

পাতাপোকা নামে একরকম পতঙ্গ আছে। ইহাদের গায়ের রং হাল্কা সবুজ এবং শরীরের গঠনও ঠিক গাছের সবুজ পাতার মত। যখন ইহারা গাছের পাতার মধ্যে অবস্থান করে, তখন সহজে খুঁজিয়া বাহির করা যায় না। ইহারা এইভাবে শত্রুর চোখে ধূলি দিয়া আত্মরক্ষা করে।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এমন অনেক কীটপতঙ্গ আছে, যাহারা দংশন ও রোগ-বীজাণু সংক্রমণ করিয়া মানুষের চরম ক্ষতি করে। এই প্রসঙ্গে মশা, মাছি, ফ্লী, ছারপোকা, সেট্‌সি ফ্লাই, স্যাণ্ড ফ্লাই ও উকুন প্রভৃতির কথা উল্লেখযোগ্য।

অবশ্য মানুষের উপকার সাধন করে, এরূপ কীটপতঙ্গেরও অভাব নাই। রেশম যে প্রজাপতি জাতীয় সিল্ক ওয়ার্মের গুটি হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা সকলেই জানেন। মৌমাছি মানুষের একমাত্র পালিত পতঙ্গ। খাদ্য ও ঔষধ হিসাবে মৌচাকের মধু যে কত প্রয়োজনীয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। মেক্সিকো ও পেরু দেশে কোচিনিল নামে এক প্রকার পতঙ্গ আছে। ইহাদের শরীর হইতে কোচিনিল নামক একরকম নির্দোষ লাল রং পাওয়া যায়। এই রং খাবার জিনিষ ও ঔষধে নির্ভয়ে ব্যবহার করা যায়। লাক্ষা-কীটের দেহনিঃসৃত রস হইতে গালা পাওয়া যায়। ছোটনাগপুরে গালার যথেষ্ট চাষ আছে। ইউরোপে ওক গাছে গল-মক্ষিকা আপেলের মত একপ্রকার গোলাকার পদার্থ উৎপাদন করে। ইহা হইতে ট্যানিক ও গ্যালিক অ্যাসিড পাওয়া যায়। ক্যান্থারিস নামক গুবরেপোকার শরীর হইতে ক্যান্থারাইডিন প্রস্তুত হয়। এতদ্ব্যতীত সাধারণভাবে দেখিতে গেলে বিভিন্ন জাতীয় অনেক কীট-পতঙ্গ ফুলের পরাগনিষেক করিয়া আমাদের মহদুপকার সাধন করিয়া থাকে। তাহারা এক ফুলের পরাগ অন্য ফুলে লইয়া গিয়া ফুল হইতে ফলোৎপাদন এবং উদ্ভিদের বংশ বিস্তারে সাহায্য করে।

আগুনের কথা

পৃথিবীর ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে, প্রায় পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে পুরাতন প্রস্তর যুগে মানুষ আগুনের ব্যবহার আবিষ্কার করে। ইহার আগে নিশ্চয় আগ্নেয়গিরির সক্রিয়তার ফলে কিংবা বজ্রাঘাত হইতে সংঘটিত অগ্নিকাণ্ড হইতে তাহাদের এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। ইহা ছাড়া কখনও কখনও প্রজ্বলিত উল্কাপাতের ফলে তাহাদের অগ্নিসংযোগের জ্ঞান লাভ হইয়া থাকিবে। গ্রীস দেশের পৌরাণিক উপাখ্যান হইতে জানা যায়—প্রোমেথিয়াস কেমন করিয়া স্বর্গ হইতে অগ্নি অপহরণ করিয়া মানবজাতিকে উপহার প্রদান করেন।

গুহাবাসী মানবের পক্ষে রন্ধন, বন্যপশু বিতাড়ন এবং শীত নিবারণের জন্য অগ্নি প্রজ্বলন অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছিল। সেই জন্য প্রাচীন কাল হইতেই বিভিন্ন জাতির মধ্যে অগ্নির উপাসনা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইতে দেখা যায়। তাহাদের নিকট আগুন বিধাতার এক বিশেষ বিকাশ বলিয়া মনে হইত। পারস্য দেশের ঋষি জোরোষ্টারের অনুবর্তীরা প্রথম হইতেই বৈশ্বানরকে ঈশ্বরের প্রধান প্রতীক মনে করিয়া যত্নের সহিত রক্ষা ও পূজা করিতেন। ইহা ছাড়া এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার অন্যান্য জাতির মধ্যেও অগ্নির উপাসনা প্রচলিত হইয়াছিল। ভারতে এখনও বেদবিহিত অগ্নিহোত্র হোম অনুষ্ঠান হইতে সর্বদা প্রজ্জ্বলিত অগ্নি সংরক্ষণ করিতে হয়। পূর্বকালে মিশর, গ্রীস, রোম, মেক্সিকো ও পেরুদেশে যে অনেক অগ্নিমন্দির নির্মিত হইয়াছিল, তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রাচীনকাল হইতে মধ্যযুগ পর্যন্ত অধিকাংশ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস ছিল, আগুন একরকম মৌলিক বস্তু। অষ্টাদশ শতাব্দীতে লাভয়সিঁয়ে ক্যাভেণ্ডিস প্রমুখ বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত চেষ্টায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, সাধারণভাবে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি অক্সিজেনঘটিত একপ্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

সচরাচর কাঠ, কয়লা ও তেল পোড়াইলে যে বহ্নিশিখার সৃষ্টি হয়, তাহার ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ও জল উৎপন্ন হয়। বাতাসের অক্সিজেন দাহ্য বস্তুর সঙ্গে মিলিত হয় বলিয়া এইরূপ ঘটে। বায়ু ব্যতিরেকে সাধারণতঃ কোন আগুনই জ্বলে না। অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম আছে; যেমন—অ্যান্টিমনি ও আর্সেনিক চূর্ণ ক্লোরিন গ্যাসে নিক্ষিপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া উঠে।

অগ্নি উৎপাদনের দুইটি প্রধান উপায় হইল—আঘাত ও ঘর্ষণ। বিশেষজ্ঞদের মতে, পূর্বোপল যুগে পাথর কাটিয়া অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ার করিবার সময় কোনক্রমে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হইয়া নিকটস্থ শুষ্ক তৃণপত্রাদিতে পড়িয়া জ্বলিয়া উঠে, অথবা শুষ্ক বৃক্ষপত্রের মধ্যে চক্‌মকির চ্যাঙড়া দিয়া স্বর্ণমাক্ষিক (Iron pyrites) ভাঙ্গিবার কালে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। ইংল্যাণ্ডে স্বর্ণমাক্ষিক ও চক্‌মুখি পাথর এখনও পাশাপাশি পাওয়া যায়। মানুষ বহু সহস্র বৎসর পূর্বেই আগুন আবিষ্কার করিয়াছে। সেই জন্য বর্তমান কালে পৃথিবীর কোথাও এমন কোন অনুন্নত আদিবাসীর সন্ধান পাওয়া যায় না, যাহারা আগুনের ব্যবহার মোটেই জানে না। ক্রমবিকাশের ফলে বনমানুষ উন্নত হইয়া যেদিন আগুনের ব্যবহার শিখিল, তখন হইতে সে মানব পদবাচ্য হইল।

আলাস্কার আদিম অধিবাসীরা আগুন জ্বালাইতে হইলে প্রথমে দুই টুকরা স্ফটিক প্রস্তরের উপর গন্ধক ঘষিয়া নেয়। তাহার পর যতক্ষণ না ঐ গন্ধক জ্বলিয়া উঠে, ততক্ষণ একটি প্রস্তরখণ্ড দিয়া অন্যটিকে ক্রমাগত আঘাত করিতে থাকে। ইহার পর ঐ অগ্নিশিখা শুষ্ক তৃণ কিম্বা পালকে ফেলিয়া জোরে প্রজ্জ্বলিত করে। মেরু

প্রদেশে এস্কিমোরা স্ফটিক ও স্বর্ণমাক্ষিক ঠুকিয়া আগুন জ্বালায়। কোন কোন আদিম জাতি কাঠে কাঠ ঘষিয়া আগুন ধরায়। একটি কাঠের খাঁজে আর একটি কাষ্ঠদণ্ড জোরে জোরে ঘর্ষণ করিয়া আগুন জ্বালান হইয়া থাকে, অথবা কোন কাঠের তক্তায় গোল গর্ত করিয়া উহার মধ্যে একটি কাঠি রাখিয়া তাড়াতাড়ি ঘুরাইলেও আগুন জ্বলিয়া উঠে। এই কাঠি ঘুরান শুধু হাতেও করা হয় কিম্বা ধনুকের মত যন্ত্রের সাহায্যও লওয়া হয়। প্রাচীনকালে এদেশে অগ্নিমন্থন দণ্ডকে অরণি বলা হইত।

সূর্যের রশ্মি উত্তল কাচ (Convex lens) কিম্বা অবতল দর্পণের সাহায্যে কেন্দ্রীভূত করিয়া অগ্নি প্রজ্বলন করা প্রাচীন যুগেই প্রচলিত হইয়াছিল। খৃষ্ট-পূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রীক নাট্যকার অ্যারিষ্টফেনিস তাঁহার মেঘ নামক নাটকে আতস কাচের বিষয় বলিয়া গিয়াছেন। বিখ্যাত দার্শনিক সক্রেটিস ও ষ্ট্রেপ্‌টিয়াডিসের কথোপকথনেও আগ্নেয় কাচের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিস (খৃঃ পূঃ ২৮৭-২১২) সাইরাকিউজের বন্দরে থাকিয়া দূর হইতে অবতল দর্পণের (Concave mirror) দ্বারা কেমন করিয়া শত্রুপক্ষের জাহাজে আগুন ধরাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। শোনা যায়, পেরুদেশে মধ্যযুগে কুমারী কন্যারা এমন এক রকম ব্রেসলেট ব্যবহার করিত, যাহাতে ছোট ছোট অবতল পেয়ালা লাগান থাকিত। ইহার সাহায্যে সৌররশ্মি একত্রিত করিয়াই নাকি তাহারা অগ্নি প্রজ্বলিত করিত।

আধুনিক কালে দেখা গিয়াছে, ছয় ফুট ব্যাস-বিশিষ্ট অবতল দর্পণের সাহায্যে তামা, রূপা বা পাথরের উপর সূর্যকিরণ কেন্দ্রীভূত করিলে, এই সকল বস্তু সহজেই গলিয়া যায়। বিজ্ঞানী বাফন ১৬৮ টুক্‌রা আর্শি জুড়িয়া এমন একটি শক্তিশালী অবতল আয়না নির্মাণ করিয়াছিলেন, যাহার সাহায্য রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে সত্তর গজ দূর হইতেও আলকাত্‌রা মাখানো কাঠে আগুন ধরানো সম্ভব হইয়াছিল।

চক্‌মকির সঙ্গে লোহা ঠুকিয়া সোলায় আগুন ধরানো ১৮৩০ সাল

অবধি প্রচলিত ছিল। বর্তমান কালে বিভিন্ন প্রকার সৌখীন পেট্রোল লাইটার উহার আধুনিক সংস্করণ। ১৮০৫ সালে রাসায়নিক দীপশলাকা আবিষ্কৃত হয়। কতকগুলি কাঠির মাথায় পটাসিয়াম ক্লোরেট, চিনি ও গঁদ মাখানো থাকিত। সালফিউরিক অ্যাসিড ভরা শিশির ভিতর এই কাঠি ডুবাইলেই আগুন জ্বলিয়া উঠিত। কিন্তু এই ব্যবস্থা অসুবিধাজনক মনে হওয়ার ফস্‌ফরাস সংযুক্ত দেশলাইয়ের উদ্ভব ঘটে।

এই সকল দেশলাইয়ের কাঠির অগ্রভাগে প্রথমে মোম কিম্বা গন্ধক লাগাইয়া লইয়া তাহার উপর হল্‌দে ফস্‌ফরাস, ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড ও শিরিষের প্রলেপ দেওয়া হইত। এই সকল কাঠি কোন অমসৃণ জায়গায় ঘষিলেই আগুন জ্বলিয়া উঠিত। কিন্তু কিছুকাল ব্যবহারের পরে এই জাতীয় দেশলাই বিপজ্জনক এবং অস্বাস্থ্যকর বোধ হওয়ায় অন্য প্রকার দেশলাই প্রস্তুতের চেষ্টা আরম্ভ হয়। আধুনিক তথাকথিত নিরাপদ দেশলাইয়ে লাল ফস্‌ফরাস ব্যবহৃত হয়। বাক্সের গায়ে লাল ফস্‌ফরাস, কাচচূর্ণ ও শিরিষ লাগানো থাকে আর কাঠিগুলির একদিকে অ্যান্টিমণি সালফাইড, পটাসিয়াম ক্লোরেট, শিরিষ ইত্যাদি মাখানো থাকে। আজকাল অবশ্য এমন দেশলাইও আছে, যাহাতে কণামাত্র ফস্‌ফরাসের অস্তিত্ব নাই।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বৈদ্যুতিক চুল্লী আবিষ্কৃত হয়। ইহার তাপমাত্রা ৩৫০০° সেন্টিগ্রেড। ১৮৭৮ সালে সার উইলিয়াম সাইমেন্স প্রথম বৈদ্যুতিক চুল্লী নির্মাণ করেন।

এখন স্বতঃ অগ্নি প্রজ্বলনের বিষয় কিছু আলোচনা করা যাক। কারণ এই ব্যাপারের সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন নিরাপত্তার যথেষ্ট সম্পর্ক আছে। পচনশীল খড় ও ঘাস-পাতার স্তূপে বিনা কারণে কখনও কখনও আপনা হইতেই হঠাৎ আগুন লাগিয়া যাইতে দেখা যায়। কোন আবদ্ধ স্থানে বায়ুর অক্সিজেন যখন পাট, তুলা বা পশমে লাগানো তিসির তেলের সঙ্গে ধীরে ধীরে সংযুক্ত হয়, তখন এক এক সময় সহসা আগুন জ্বলিয়া উঠিতে পারে। তারপিন তৈলনিষিক্ত

কাষ্ঠতন্তুতে এইভাবেই আগুন লাগে। স্তূপাকারে রাখা কয়লাতেও কোন কোন সময় আপনা হইতেই আগুন লাগিয়া যায়। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, ঘটনাক্রমে বাতাসের অক্সিজেন কয়লার সহিত দ্রুত মিলিত হয়, অথবা উহার অন্তর্গত লৌহ ও গন্ধকের সঙ্গে দ্রুত সংযুক্ত হয়, সেই জন্য হঠাৎ আগুন ধরিয়া উঠে।

সকলেই জানেন, কয়লার খনির অভ্যন্তরে যদি বেশ খানিকটা মিথেন গ্যাসের অবস্থিতি ঘটে কিম্বা বাতাসে প্রচুর পরিমাণ কয়লাচূর্ণ সঞ্চিত হয়, তাহা হইলে সামান্য অগ্নিশিখা কিম্বা বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের স্পর্শেই দারুণ বিস্ফোরণ সংঘটিত হয়। পেট্রোলের মধ্যে রেশম কিম্বা পশম ঘষিয়া পরিষ্কার করিবার কালে সামান্য মাত্র বিদ্যুৎ-কণা উৎপন্ন হইয়া দারুণ অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি কবিতে পারে। এমন কি—গাড়ী করিয়া যাতায়াতের সময় পেট্রোল অতিরিক্ত আন্দোলিত হইলে আপনা হইতেই বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হইয়া বিষম বিস্ফোরণেব কারণ ঘটাইতে পারে।

সময় সময় সূক্ষ্ম লৌহকণা আর্দ্র বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে সম্মিলিত হইবার কালে অগ্নি উৎপাদন করে। এরূপ একটি ঘটনা ১৯০০ সালে আমেরিকার ভার্জিনিয়া প্রদেশে সংঘটিত হইয়াছিল। রিচমণ্ড শহরে কোন জাহাজ কোম্পানী কাটা ও গুঁড়া লোহা চালান দিবার জন্য গাড়ী বোঝাই করিতেছিল। রাত্রি বেলায় গাড়ীর খোলা জায়গা দিয়া প্রবল বায়ু ও প্রচুর তুষার প্রবেশ করে এবং তাহার ফলে বাতাসের অক্সিজেন ও সদ্য তুষার গলা জল উভয়ের সম্মিলিত প্রতিক্রিয়ায় নূতন চক্‌চকে লৌহকণায় সহজেই আগুন লাগিয়া যায়।

রাত্রির অন্ধকারে জলাভূমিতে আলেয়ার অগ্নিশিখাকে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে দেখিয়া অনেকেই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া থাকেন। বৈজ্ঞানিক-দের মতে, আর্দ্র স্থানে যখন প্রাণী ও উদ্ভিদদেহ বিগলিত ও বিকার প্রাপ্ত হয়, তখন মিথেনের সঙ্গে ফস্‌ফিন গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই গ্যাস বায়ুর সংস্পর্শে আসিলেই জ্বলিয়া উঠে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসীরা ইহাকেই ভূতুড়ে আলো মনে করিয়া ভয় পায়। চুনের

জলের সঙ্গে ফস্‌ফরাস উত্তপ্ত করিলেও এই গ্যাস বাহির হইতে থাকে।

হাওয়াতে যদি প্রচুর পরিমাণ আটার সূক্ষ্ম কণা থাকে, তাহা হইলে অগ্নিসংস্পর্শে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিতে পারে। এই জন্য আটার কলের কাছে বাতি জ্বালানো নিরাপদ নয়। ১৯১৩ সালে নিউ-ইয়র্কের কোন এক আটার কলে এইরূপ বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ড হইয়াছিল। ইহার ফলে ৩৩ জন নিহত ও ৮০ জন আহত হয় এবং কারখানাটি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়।

সুগোল কাচের বোতলে জল ভরিয়া রৌদ্রে আনিলে উহা অনেকটা উত্তল কাচের মত সূর্যরশ্মি কেন্দ্রীভূত করিয়া উত্তাপ উৎপন্ন করে। এমনও হইয়াছে যে, জানালার কাছে রাখা লালমাছের জলপূর্ণ কাচের গোলাকার আধারে রৌদ্র পড়িয়া নিকটস্থ পর্দায় অগ্নি সংযোগ করিয়াছে। অনেক সময় প্রখর সূর্যকিরণ গোল শিশিরবিন্দুর মধ্য দিয়া কেন্দ্রীভূত হইয়া গাছের পাতায় দহনচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া যায়।

বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লেখক ফ্রান্সের জুলে ভার্নে (১৮২৪-১৯০৫) তাঁহার ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের অভিযান নামক পুস্তকে বরফের সাহায্যে অগ্নি-প্রজ্বালনের খুব সুন্দর এক উদাহরণ দিয়াছেন। এই গল্পে ডাক্তার ক্লবনি প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় তাঁহার অসহায় সঙ্গীদের জন্য কুঠারের সাহায্যে বরফের লেন্স তৈয়ার করিয়া অগ্নি উৎপাদন করেন। জুলে ভার্নের কাহিনী মোটেই অসম্ভব বা অবিশ্বাস্য নয়। ১৭৬৩ সালে ইংল্যাণ্ডে এই ভাবে সত্য সত্যই অগ্নি উৎপাদন করা হইয়াছিল। শীতপ্রধান দেশে অপেক্ষাকৃত সহজ উপায় হইল—কোন গোল বাটির মধ্যে জল জমাইয়া বরফের লেন্স নির্মাণ করিয়া লওয়া। আশ্চর্যের ব্যাপার, এইরূপে অগ্নি প্রস্তুতের সময় বরফের চাক্‌তি উত্তপ্ত হইয়া গলিয়া যায় না।

এতদ্ব্যতীত জলের মধ্যে ধাতব পটাসিয়াম নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ আগুন জ্বলিয়া উঠে। সিলিকন হাইড্রাইড ও জিঙ্ক ইথাইল বায়ুর সংস্পর্শে আসিবামাত্র প্রজ্বলিত হয়।

এক-একটি রাসায়নিক পদার্থ এতই অনুভূতি-সম্পন্ন যে, উহার উপর সামান্য আঘাত পড়িলেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয় এবং বিস্ফোরণ ঘটে। গান-কটন, নাইট্রোগ্লিসারিন, মার্কারি ফুল্মিনেট, নাইট্রোজেন আয়োডাইড ও ট্রাইক্লোরাইড প্রভৃতি এই শ্রেণীর বস্তু। নাইট্রোজেন আয়োডাইড এতই সহজদাহ্য যে, উহাকে পালক দিয়া স্পর্শ করিলে, এমন কি—উহার উপর মাছি বসিলেই বিস্ফোরণ ঘটে। প্রসিদ্ধ ফরাসী রাসায়নিক ডুলঙ এই জাতীয় বিস্ফোরক জিনিষ লইয়া নাড়াচাড়া করিবার কালে একটি চোখ ও তিনটি আঙ্গুল হারাইয়া ছিলেন।

এই সম্পর্কে রঙীন আগুন ও আতসবাজির কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আতসবাজির উৎপত্তি প্রাচ্য ভূখণ্ডে—চীনদেশে। এখান হইতেই এই বিদ্যা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপে উপনীত হয়। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতেই ইহার প্রকৃত উন্নতি ঘটে। আতসবাজির প্রধান উপকরণ কাঠকয়লা ও গন্ধকচূর্ণ। এই দুই বস্তু জ্বলিবার জন্য অক্সিজেনবহুল পটাসিয়াম নাইট্রেট বা পটাসিয়াম ক্লোরেট যোগ করা হয়। আলো রঙীন করিবার উদ্দেশ্যে বিবিধ ধাতব লবণ দেওয়া হইয়া থাকে ; যেমন—ষ্ট্রনসিয়াম দিলে লাল আলো, আর তামা ও বেরিয়াম দিলে যথাক্রমে নীল ও সবুজ রং হয়। হলদে আলো করিতে হইলে সোডিয়ামের উপস্থিতি প্রয়োজন, আর পটাসিয়ামের অস্তিত্ব থাকিলে বেগুনী রং হয়। ক্যালসিয়াম সংযোগে কমলা রঙের আলো হয়। ম্যাগ্নেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম ও লৌহচূর্ণ উজ্জ্বল আলোক ও সুন্দর স্ফুলিঙ্গ উৎপাদন করে।

আবদ্ধ পাত্রের বায়ু অকস্মাৎ অতিরিক্ত সঙ্কুচিত করিলে তাহা অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠে এবং এই সময় তৈলাদি পদার্থ তাহার সংস্পর্শে আসিলেই প্রজ্বলিত হয়। আজকাল ডিজেল ইঞ্জিনে এই প্রক্রিয়া কাজে লাগান হইয়াছে।

আগুন মানুষের পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত হইলে উহাই আবার ভীষণ আকার ধারণ করিয়া ধনপ্রাণের বিষম ক্ষতি সাধন করে।

১৬৬৬ সালে লণ্ডনে সংঘটিত বিরাট অগ্নিকাণ্ড ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ অগ্নিকাণ্ড ৩৭৩ একর পরিমাণ স্থানে বিস্তৃতলাভ করিয়া চার দিনে ১৩২০০ বাড়ী ভস্মীভূত করে। এই অগ্নিকাণ্ডে ২০০০০০ জন গৃহহীন হইয়াছিল।

বর্তমান কালে ব্যাপক অগ্নি নির্বাপণের জন্য প্রবল বেগে জলধারা নিক্ষেপ করা হয় এবং সজোরে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। পেট্রোলের আগুন নিবাইবার সময় প্রচুর বালুকা প্রক্ষিপ্ত হয়।

এমন অনেক রাসায়নিক দ্রব্যের অস্তিত্ব আছে, যাহা কাঠ, কাগজ বা কাপড়ে প্রয়োগ করিলে ঐ সকল বস্তু কমবেশী অদাহ্য হয়। সোডিয়াম সিলিকেট, সোহাগা, লবণ, ফট্‌কিরি, জিঙ্ক সালফেট প্রভৃতি এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আজকাল অবশ্য অ্যাসবেস্টস তন্তু দিয়া এরূপ বস্ত্র তৈয়ারী হয়, যাহা সম্পূর্ণরূপে অগ্নিনিরোধক।

হৃদ্‌যন্ত্রের কথা

যতক্ষণ হৃৎস্পন্দন, ততক্ষণই জীবন। জীব-দেহে হৃৎপিণ্ডের কাজ ঠিক স্বয়ংক্রিয় পাম্পের মত। এর সাহায্যে নিয়ত পুষ্টিকর রস ও অক্সিজেন সর্বশরীরে সঞ্চালিত হয়ে থাকে। মানুষের হৃৎপিণ্ড বুকের মধ্যে দুই ফুস্‌ফুসের মাঝখানে ঈষৎ বাঁ-দিকে অবস্থিত। এটি প্রায় ত্রিকোণাকার—অনেকটা মুষ্টিবদ্ধ হাতের সমান। পুরুষের হৃৎপিণ্ডের গড় ওজন প্রায় ১০ আউন্স আর মেয়েদের হৃদ্‌যন্ত্রের ওজন প্রায় ৮ আউন্স। আমাদের হৃৎপিণ্ড চারটি কুঠুরিতে বিভক্ত। উপরের দুটি অংশের নাম অলিন্দ (Auricles) এবং নীচের অংশদ্বয়ের নাম নিলয় (Ventricles)। হৃৎপিণ্ড প্রতি মিনিটে প্রায় ৭২ বার পর্যায়ক্রমে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়ে শরীরের সমস্ত কোষে রক্ত চালনা করে।

শরীরের সব অংশ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড-যুক্ত নীলাভ দূষিত রক্ত এসে মহাশিরা দিয়ে হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অলিন্দে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে দক্ষিণ নিলয়ে আগমন করে। উভয়ের মাঝখানে একটি ত্রিপত্র কপাট আছে, যা কেবল একদিকেই খোলে। দক্ষিণ নিলয় থেকে ধমনি দিয়ে ঐ রক্ত ফুস্‌ফুসে গমন করে। ফুস্‌ফুসের মধ্যে রক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে এবং নতুন করে অক্সিজেন গ্রহণ করে উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ ধারণ করে। ফুস্‌ফুসের শিরা থেকে শোধিত রক্ত বের হয়ে আবার হৃৎপিণ্ডের বাম অলিন্দে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে বাম নিলয়ে যায়। উভয়ের মধ্যে একটি দ্বিধাবিভক্ত কপাট আছে। বাম নিলয় থেকে মহাধমনি দিয়ে রক্ত সমস্ত শরীরে গমন করে এবং পরে আবার শিরার মধ্য দিয়ে হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অলিন্দে ফিরে আসে। এইভাবে রক্ত চলাচল হয়। ধমনি ও শিরা ক্রমশঃ সরু হতে হতে অসংখ্য জালক নালীতে (Capillaries) পরিণত

হয়ে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। এই সব জালের মত কৈশিক নালীর মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৭৫০০০ মাইল।

১৬২৮ খৃঃ অব্দে ইংরেজ চিকিৎসক উইলিয়াম হার্ভি রক্ত-সঞ্চালন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ ও বাম অলিন্দ সঙ্কুচিত হয়ে যথাক্রমে শরীরের দূষিত রক্ত দক্ষিণ নিলয়ে ও বায়ুপূর্ণ রক্ত বাম নিলয়ে প্রেরণ করে। আর দক্ষিণ ও বাম নিলয় সঙ্কুচিত হয়ে যথাক্রমে ফুস্ফুসে দূষিত রক্ত ও সমস্ত শরীরে শোধিত রক্ত সঞ্চালিত করে। শোণিত সঞ্চলনের মূলতত্ত্ব এই।

হৃৎপিণ্ডের পেশীর মধ্যে করোনারি ধমনি তুটি দিয়ে রক্ত প্রবেশ করে। তুই রকম স্নায়ু হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করে থাকে—ভেগাস স্নায়ু হৃৎপিণ্ডের গতি মন্থর করে, আর সিমপ্যাথেটিক স্নায়ু হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত করে দেয়। এছাড়া উত্তাপের ফলে হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে যায় আর শৈত্য প্রয়োগে এর বেগ মন্থর হয়ে আসে।

সাধারণ মানুষের হৃৎপিণ্ড প্রতিদিন প্রায় এক লক্ষ বার স্পন্দিত হয়। এর ফলে যে কাজ হয়, তাতে ২৪ ঘণ্টায় ২৭ মণ ওজন ৮২ ফুট উপরে তোলা যায়। প্রতি মিনিটে আমাদের হৃৎপিণ্ড প্রায় পাঁচ সের বিশুদ্ধ রক্ত পাম্প করে শরীরে চালনা করে। মহাধমনিতে রক্তস্রোত প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় তুই ফুট বেগে চলাচল করে। শিরার মধ্যে শোণিতের গতিবেগ এর প্রায় অর্ধেক। কৈশিক নাড়ীর ভিতর রক্তের গতি মিনিটে এক ইঞ্চি। প্রতিবার স্পন্দনে আমাদের হৃৎপিণ্ড প্রায় ১০০ কিউবিক সেণ্টিমিটার রক্ত চালনা করে। প্রতিবার পূর্ণ স্পন্দনের পর মানুষের হৃৎপিণ্ড গড়ে প্রায় সিকি সেকেণ্ড আন্দাজ বিশ্রাম গ্রহণ করে; অর্থাৎ মানুষের জীবনকাল যদি ৭০ বছর ধরা হয়, তাহলে প্রায় সতেরো-আঠারো বছরের মত তার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া স্থগিত থাকে।

স্বাভাবিক সুস্থ লোকের হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচনকালীন (Systolic) রক্তচাপ ১২০—১৪০ মিলিমিটার এবং হৃৎপিণ্ডের প্রসারণকালীন (Diastolic) রক্তচাপ ৬০—৯০ মিলিমিটার পরিমাণ পারদচাপের

মত হয়ে থাকে। স্ফিগ্‌মোম্যানোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে ধমনির মধ্যেকার রক্তচাপ মাপা হয়।

বিভিন্ন বয়সে মানুষের হৃদ্‌স্পন্দন কি প্রকার হয়ে থাকে, তার একটি তালিকা নীচে দেওয়া হলো।

জন্মকাল থেকে	প্রতি মিনিটে
এক বছর বয়স পর্যন্ত	১৪০ বার
শৈশবকালে	
তিন বছর বয়স পর্যন্ত	১২০—১০০ বার
বাল্যকালে	
ছয় বছর বয়স পর্যন্ত	১০০—৯০ বার
৭ থেকে ১৪ বছর ,,	৯০—৭৫ বার
১৪ ,, ২১ ,, ,,	৮৫—৭৫ বার
২১ ,, ৬৫ ,, ,,	৭৫—৬৫ বার
বৃদ্ধ বয়সে	৮৫—৭০ বার

গড়ে পুরুষের নাড়ী মিনিটে ৭২ বার স্পন্দিত হয়, আর মেয়েদের নাড়ীর গতি মিনিটে প্রায় ৮০ বার।

বিভিন্ন জাতীয় জীবজন্তুর হৃদ্‌স্পন্দনের মাত্রা এই রকম দেখা যায়ঃ—

ঝিনুক	প্রতি	মিনিটে	২-২০ বার
স্কুইড (শম্বুক জাতীয় জীব)	,,	,,	৪০-৮০ ,,
বড় ও ছোট ইঁদুর	,,	,,	৩০০-৫০০ ,,
বড় বাদুড়	,,	,,	১০০ ,,
খরগোস	,,	,,	২০০ ,,
মুরগী	,,	,,	১৫০-১৮০ ,,
বড় ও ছোট পাখী	,,	,,	২০০-৬০০ ,,
সিংহ ও বাঘ	,,	,,	৪০-৬৪ ,,
ঘোড়া	,,	,,	৪২ ,,
উট	,,	,,	৩২ ,,

হাতী	”	”	২৫ ”
তিমি	”	”	৭ ”

সাধারণতঃ যে জীব যত বড় ও ভারী তার হৃদ্‌স্পন্দন ও শ্বাসক্রিয়া তত মন্থর হয়ে থাকে।

১৮১৮ সালে ফ্রান্সের ডাক্তার লেনেক মানুষের হৃৎপিণ্ডের শব্দ পরীক্ষা করবার জন্যে ষ্টেথোস্কোপ নামক যন্ত্র আবিষ্কার করেন। তাছাড়া আজকাল হৃৎপিণ্ডের গঠন ও আকৃতি এক্স-রে দিয়ে নির্ভুল ভাবে নির্ণয় করা হয়। প্রতিবার হৃদ্‌স্পন্দনের সঙ্গে যৎসামান্য বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়ে থাকে। এই বিদ্যুৎ-স্রোত হৃৎপিণ্ডের সক্রিয় অংশ থেকে নিষ্ক্রিয় অংশের দিকে প্রবাহিত হয়। এই বিদ্যুৎ-প্রবাহের গতি ও প্রকৃতি ইলেক্টোকার্ডিওগ্রাফ নামক যন্ত্রের সাহায্যে নিখুঁতভাবে স্থির করা যায় এবং এথেকে হৃদ্‌যন্ত্রের অবস্থা খুব সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হয়। ফোনোকার্ডিওগ্রাফ যন্ত্রের দ্বারা ফিতার উপর হৃৎপিণ্ডের শব্দলিপি অঙ্কিত করা হয়। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনজনিত শরীরের কম্পন ব্যালিষ্টোকার্ডিওগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে। রোগ নির্ণয়ের জন্যে এক এক সময় রক্তবহা নালীর মধ্য দিয়ে একেবারে হৃৎপিণ্ডের ভিতর রবারের নল প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে।

কিছুক্ষণ ধরে কঠিন দৈহিক পরিশ্রম করলে সব মানুষেরই হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত ও রক্তচাপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু হৃদ্‌যন্ত্র সুস্থ থাকলে শারীরিক শ্রম অবসানের প্রায় তিন মিনিটের মধ্যে নাড়ীর গতি ও রক্তচাপ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। এটি শারীরিক সুস্থতা পরীক্ষার একটি খুব ভাল উপায়। হৃদ্‌যন্ত্রের ব্যাধিতে বিশ্রমকালীন নাড়ীর গতি অতিদ্রুত কিম্বা অতি মন্থর অথবা অনিয়মিত হয়ে পড়ে। হৃৎপিণ্ডের অসুস্থতার প্রধান লক্ষণ বুকের বেদনা, শ্বাস-কষ্ট, মাথাঘোরা এবং বুকের মধ্যে চাপবোধ হওয়া। হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হয়ে গেলে প্রায়ই শোথরোগ প্রকাশ পায়।

গুরুভোজন, অতিরিক্ত মানসিক শ্রম ও শরীর চালনার নিতান্ত অভাব ঘটলে প্রায়ই হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হয়ে পড়ে। চা, কফি, তামাক

এবং মদ্যপানের আধিক্য হলেও হৃদ্‌যন্ত্র অসুস্থ হয়ে যায়। ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস জীবাণুজনিত বাতজ্বর, যৌনব্যাধি ও বীজাণুর আক্রমণেও মানুষের হৃৎপিণ্ড বিপন্ন হয়ে পড়ে। তাছাড়া ডিপথিরিয়া, যক্ষ্মা, টাইফাস ও টাইফয়েড জ্বর, আমাশয়, লালজ্বর ও তীব্র সর্দিজ্বর (Influenza) হলেও মানুষের হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে। পুষ্টিহীনতা, রক্তাল্পতা, স্থূলতা এবং যকৃৎ ও বৃক্কের ব্যাধির সঙ্গে সাধারণতঃ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াও অল্লাধিক প্রভাবিত হয়ে থাকে। অনেক দিন ধরে ধমনির রক্তচাপ বেড়ে থাকলেও হৃদ্‌যন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অতিরিক্ত স্নায়বিক উত্তেজনা, দুশ্চিন্তা, অবসাদ ও অনিদ্রা দীর্ঘকাল স্থায়ী হলেও মানুষের হৃদ্‌যন্ত্রের কার্যক্ষমতা ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হয়।

হৃৎপিণ্ডের উত্তেজক ওষুধ হিসাবে কর্পূর, কেফিন, কোরামিন ও ষ্ট্রিকনিন প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। আর হৃদ্‌যন্ত্রের অত্যধিক উত্তেজনা প্রশমন ও বেদনা নিবারণের জন্য মর্ফিন, পেথিডিন, ভেলেরিয়ান ও ও ব্রোমাইড প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। হৃৎপিণ্ড দুর্বল ও নাড়ীর গতি দ্রুত হলে ডিজিট্যালিস, ষ্ট্রপান্থাস ও কুইনিডিন প্রয়োগ করে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া সবল ও নিয়মিত করা হয়। ১৭৮৫ সালে সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ চিকিৎসক উইলিয়াম উইদারিং ডিজিট্যালিসের এই ভেষজগুণ আবিষ্কার করেন। অসুস্থতার দরুণ হৃৎপিণ্ডের মধ্যেকার ধমনি অতিরিক্ত সরু হয়ে গেলে, যখন তার মধ্যে রক্ত চলাচলে ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, তখন বুকে ব্যথা বোধ হয়। এই সময় নাইট্রোগ্লিসারিন, নাইট্রাইট এবং অ্যামাইনোফাইলিন প্রয়োগ করে রোগীর কষ্ট লাঘব করা হয়। কারণ, এই সব ওষুধ সেবনের ফলে শরীরের রক্তবাহী নলগুলি প্রসারিত হয় এবং রক্ত চলাচলের বৃদ্ধি ঘটে। কোন রকম শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হলে যন্ত্রের সাহায্যে অক্সিজেন প্রয়োগ করা হয়। উক্ত রক্তচাপ রোগে আমাদের দেশের ভেষজ সর্পগন্ধা আজকাল খুবই সাফল্যের সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে।

পুষ্টিহীনতা ও দুর্বলতার জন্যে হৃদ্‌যন্ত্র ব্যাধিগ্রস্ত হলে লৌহ, ফস্‌ফরাস ও নানারকম ভিটামিন ব্যবহার করা হয়। হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের

ক্রিয়া মন্থর হয়ে পড়লে আধ আউন্স মাত্রায় সুরাসার প্রয়োগ করলে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। কোন কারণে অবসন্ন, ক্লান্ত ও দুর্বল বোধ করলে সামান্য পরিমাণ চিনি, মধু কিম্বা গুড় খেয়ে নেওয়া উচিত। তাহলে অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার শরীর সতেজ ও সবল হয়ে উঠবে। আজকাল কৃত্রিম উপায়ে রক্ত সঞ্চালনের ব্যবস্থা করে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দশ-পনেরো মিনিটের জন্যে স্থগিত রেখে অস্ত্রোপচারের সাহায্যে রুগ্ন হৃদ্‌যন্ত্র সবল ও সুস্থ করা সম্ভব হচ্ছে।

হৃদ্‌যন্ত্র সুস্থ রাখতে হলে চা, কফি, মদ্য ও ধূমপান অত্যন্ত পরিমিতভাবে করা আবশ্যক। এই সব নেশার জিনিষ একেবারেই বাদ দিতে পারলে সবচেয়ে ভাল হয়। প্রতিদিন পরিমিত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। অতিরিক্ত আহার ও অত্যল্প ভোজন —দুই-ই সমান ক্ষতিকারক। প্রৌঢ় বয়সে ঘি, মাখন, ক্ষীর, ডিম এবং চর্বিযুক্ত মাছ ও মাংস ভক্ষণ যতদূর সম্ভব কম করা উচিত। যাঁরা অতিরিক্ত মানসিক শ্রম করেন ও সেই সঙ্গে গুরুভোজনে অভ্যস্ত, তাঁদের প্রত্যহ কোন না কোন রকম শ্রমসাধ্য ব্যায়াম করা উচিত। দৈনিক অন্ততঃ একঘণ্টা কাল মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণের অভ্যাস রাখলেও হৃৎপিণ্ডের পীড়া থেকে অনেকাংশে মুক্ত থাকা যায়। প্রত্যহ নিয়মিত ব্যায়াম করলে মানুষের হৃৎপিণ্ডের কার্যক্ষমতা রীতিমত বেড়ে যায়।

হৃদ্‌যন্ত্র সুস্থ ও সবল রাখতে হলে ব্যায়াম ও বিশ্রামের একটা সাম্য থাকা বাঞ্ছনীয়। রাত্রে অন্ততঃ আট ঘণ্টা সুনিদ্রা হওয়া উচিত, তাহলে স্নায়বিক ক্রিয়া স্বাভাবিক থাকবে।

আজকাল করোনারি থ্রম্বসিসের খুবই প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এই রোগে হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরস্থ করোনারি ধমনির মধ্যে রক্ত জমাট বেঁধে যাবার ফলে ঐ অংশে শোণিত সঞ্চলন বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। সে জন্যে রোগী দারুণ ব্যথা ও কষ্ট বোধ করে। এই অসুখ এক দিনের নয়। গুরুতর মানসিক শ্রম, প্রচুর পরিমাণে গুরুপাক দ্রব্য ভোজন এবং সেই সঙ্গে শরীর চালনার একান্ত অভাব ঘটলে

কোলেষ্টেরল সঞ্চারের ফলে মানুষের সব রক্তবহা নাড়ী অপরিসর ও অনমনীয় হয়ে আসে।

তাছাড়া এই সব ক্ষেত্রে রক্ত সহজেই জমাট বেঁধে যাবার সম্ভবনা থাকে। সুতরাং কোন এক সময় হৃৎপিণ্ডের ভিতর কোথাও রক্ত জমে গেলে রোগীর জীবনসংশয় উপস্থিত হয়। এই রোগের চিকিৎসায় প্রধানতঃ অক্সিজেন, আফিং ও হিপারিন নামক রক্ত-তরলকারী ভেষজ প্রযুক্ত হয়।

মানুষের হৃদ্‌যন্ত্রের ক্ষমতা কিরূপ আশ্চর্যজনক হতে পারে, সে নিয়ে এখন কিছু আলোচনা করে দেখা যাক। সুপ্রসিদ্ধ রাশিয়ান দৌড়বাজ জামেনস্কির বিশ্রামকালীন হৃৎপিণ্ডের গতি ছিল মিনিটে ৪০ বার মাত্র, তাঁর রক্তচাপও খুব কম থাকতো। সোভিয়েট রাশিয়ার একজন লোকের আঠারো বছর বয়সে বন্দুকের গুলি লেগে হৃৎপিণ্ডের বাম অলিন্দ ও নিলয়ের মধ্যবর্তী দ্বিপত্র কপাটিকা বিদীর্ণ হয় এবং গুলিটি হৃৎপিণ্ডের ভিতরেই থেকে যায়। তাকে হাসপাতালে তিন মাস ধরে চিকিৎসা করবার পর ভাল মনে করে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং সে বাড়ী ফিরে গিয়ে আবার নিজের আগেকার শারীরিক শ্রমসাধ্য কাজে পূর্ণোদ্যমে যোগদান করে। এই ঘটনার দশ বছর পরেও তাকে সুস্থ থাকতে দেখা গিয়েছিল। ১৮৯৮ সালে ঈজিপ্টে ওমডারমানের যুদ্ধে বৃটিশ সেনাপতি সার আর্থার স্লগেটের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে গুলি লাগে। তাঁর ডাক্তারদের অবাক করে দিয়ে তিনি এরপর আরও ৩১ বছর জীবিত ছিলেন এবং পরিশেষে ৭১ বছর বয়সে মারা যান।

শোনা যায় ইটালীর নেপেল্‌স্‌ নগরীর অধিবাসী জিউসেপ-ডি-সায় নামক এক ব্যক্তির একটির বদলে বুকে দুটি হৃৎপিণ্ড ছিল। তিনি ১৮৯৪ সালে লণ্ডন অ্যাকাডেমি অফ মেডিসিনের নিকট থেকে প্রায় ১৫ হাজার ষ্টার্লিং অর্থ গ্রহণ করে এই চুক্তিতে আবদ্ধ হন যে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দেহ ব্যবচ্ছেদ করতে দেওয়া হবে এবং জীবিতকালে তিনি কখনও সমুদ্রযাত্রা করবেন না। লেখকের বন্ধু অধ্যাপক অজিত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের হৃৎপিণ্ড বুকের বাঁ দিকে না থেকে ডান দিকে

অবস্থান করতে দেখে ডাক্তারেরা বিস্ময় বোধ করছেন। গত শতাব্দীর মধ্য ভাগে লণ্ডনের কর্ণেল টাউনশেণ্ড নিজের হৃৎপিণ্ডের গতি ইচ্ছামত অবরুদ্ধ ও পরিচালিত করতে পারতেন। একবার ডক্টর চেন ও বেনার্ডের সামনে তিনি নিজের হৃদযন্ত্র আধ ঘণ্টার জন্যে একেবারে থামিয়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য এর কিছুকাল পরে তিনি মারা যান।

১৯১৬ সালে লণ্ডনের গাইস হাসপাতালে ডেভিস নামক একটি ছয় বছরের বালকের যখন অজ্ঞান অবস্থায় টন্সিলে অস্ত্রোপচার করা হচ্ছিল, তখন অকস্মাৎ তার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া থেমে যায়। তৎক্ষণাৎ বুকের পার্শ্বদেশ বিদীর্ণ করে তার হৃৎপিণ্ড মৃদুভাবে মর্দন করা হতে থাকে। এর ফলে হৃদ্‌যন্ত্র পুনরায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। পরে ছেলেটি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করে এবং স্বাভাবিকভাবে চেলাফেরা ও দৌড়া-দৌড়ি করতে পারে। এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বেশ কিছু সময়ের জন্য স্থগিত ছিল। অস্ত্রোপচার না করেও আজকাল বক্ষাস্থির উপর তালে তালে হাতের চাপ দিয়ে স্তব্ধ হৃৎপিণ্ডকে পুনরায় সক্রিয় করবার চেষ্টা হয়ে থাকে।

রাশিয়ান ডাক্তার এণ্ড্রিয়েভ (১৮৭৯-১৯৫২) কুকুরের হৃৎপিণ্ড পুনরুজ্জীবিত করবার এক উপায় আবিষ্কার করেন। ১৯১৩ সালে একবার তিনি একটি কুকুরকে প্রথমে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন। তারপর অ্যাড্রিনালিনযুক্ত রাসায়নিক রস তার হৃৎপিণ্ডের দিকে কোন ধমনিতে প্রবেশ করিয়ে দেন। এর ফলেই কুকুরটির হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া পুনরায় সচল হয়ে উঠলো এবং শ্বাস-প্রশ্বাসও আবার আরম্ভ হয়ে গেল। সেই কুকুরটি পুনর্জীবন লাভ করলো এবং এই পরীক্ষার পর সে আরও কয়েক ঘণ্টা বেঁচেছিল। নেগভস্কির প্রণালীতে হৃৎপিণ্ডের দিকে কোন ধমনীতে রক্ত পাম্প করে অনেক সদ্যমৃত রোগীর দেহে প্রাণ সঞ্চার করা সম্ভব হয়েছে—যাদের হৃদ্‌যন্ত্র ও শ্বাসক্রিয়া থেমে যাবার দরুণ আপাতদৃষ্টিতে মৃত্যু ঘটেছিল। ১৯৪১ সালে ডাঃ সিনিৎসিন একটি ব্যাঙের হৃৎপিণ্ড কেটে বের করে তার জায়গায় আর একটি ব্যাঙের হৃৎপিণ্ড জুড়ে দিয়েছিলেন এবং

এরপর প্রথম ব্যাঙটি অনেকক্ষণ পর্যন্ত বেঁচেছিল। ১৯৪৬ সালে ডাঃ ডেমিকভ কোন কুকুরের হৃৎপিণ্ড ও ফুস্‌ফুস—দুটিই বদলে দিয়েছিলেন, তৎসত্ত্বেও সে বেশ কয়েক দিন ধরে বেঁচে থেকে ঘুরে বেড়িয়েছিল এবং স্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণ করেছিল। সেই বছরেই ডাঃ ডেমিকভ আর একটি পরীক্ষা সম্পাদন করেন। তিনি একটি সাধারণ কুকুরের শরীরের সঙ্গে আর একটি হৃৎপিণ্ড যোগ করে দিয়েছিলেন। অস্ত্রোপচারের পর এই কুকুরটির একটির পরিবর্তে দুটি কার্যক্ষম হৃৎপিণ্ড হয়েছিল।

অধ্যাপক রিঙ্গার কর্তৃক উদ্ভাবিত অক্সিজেন ও গ্লুকোজ সহযোগে প্রস্তুত নিম্ন-নির্দিষ্ট রাসায়নিক দ্রবে যদি কোন খরগোসের হৃৎপিণ্ড আলাদা করে রাখা হয়, তাহলে সেটি অনেকক্ষণ অবধি বেঁচে থেকে স্পন্দিত হতে থাকে। অনুরূপ ক্ষেত্রে কচ্ছপের মত কোন শীতল রক্তের প্রাণীর হৃৎপিণ্ড স্থাপন করলে বহু সপ্তাহ পর্যন্ত জীবন্ত থাকে। এই রাসায়নিক দ্রবণের মাত্রা নিম্নোক্তরূপ ঃ—

সোডিয়াম ক্লোরাইড	·৮%
পটাসিয়াম ক্লোরাইড	·০২%
ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড	·০২%
ম্যাগ্‌নেসিয়াম ক্লোরাইড	·০১%
সোডিয়াম বাইকার্বনেট	·১%
জল	অবশিষ্ট অংশ

অসাধারণ গণনাশক্তি

কখনও কখনও অসাধারণ গাণিতিক প্রতিভাসম্পন্ন এমন দুই-চারিজন লোকের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, যাঁহারা কাগজ কলমের কোনরূপ সাহায্য না লইয়া বড় বড় গুণ, ভাগ, বর্গমূল প্রভৃতি অঙ্ক মুহূর্তের মধ্যে মুখে মুখে সম্পন্ন করে সমবেত দর্শকবৃন্দের বিস্ময় উৎপাদন করেছেন। ইঁহাদের গণনাশক্তি এতই আশ্চর্যজনক যে না দেখলে সহজে বিশ্বাস হয় না। নিম্নে এরূপ কয়েকজন অসাধারণ গণকের কথা বিবৃত হল।

প্রথমেই জর্জ বিডারের নাম উল্লেখ যোগ্য, ইনি ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। যখন তাঁর বয়স ছয় বৎসর, তখন তাঁকে শুধু ১ হতে ১০০ পর্যন্ত গুণতে শিখান হয়। কিন্তু তাঁর বুদ্ধি এতই তীক্ষ্ণ ছিল যে কেবল কতকগুলি মার্বেল গুলি ও বোতামের সাহায্যে যোগ, বিয়োগ ও গুণ সত্বর তিনি নিজের চেষ্টাতেই শিখে ফেলেন। ইহার পর হতেই ক্রমশঃ তাঁর মানসাঙ্ক লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে এবং তাঁর পিতা তাঁকে নিয়ে নানাস্থানে ঘুরে পুত্রের গণনাশক্তি প্রদর্শন করে বেশ দু-পয়সা রোজগার করতে থাকেন। অতঃপর তাঁরা দুজনে ঘুরতে ঘুরতে এডিনবরায় এসে উপস্থিত হন। তত্রস্থ অধ্যাপক-মণ্ডলী তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হন এবং বিডারকে তাঁদের নিকট রেখে সুশিক্ষিত করবার জন্য তাঁর পিতাকে বারবার অনুরোধ করতে থাকেন। ইহার ফলে বিডার তাঁদের নিকট রয়ে গেলেন এবং যথাসময়ে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পাশ করে বার হলেন। পরে তিনি ইঞ্জিনীয়ারের বৃত্তি গ্রহণ করেন এবং ঐ কাজে লিপ্ত থেকে যশস্বী হন। ১৮৭৮ সালে বিডারের মৃত্যু হয়।

এখন তাঁর গণনাশক্তির কথা বলব। ১৮১৫ সালে যখন তাঁর বয়স নয় বৎসর, তখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয়—'চাঁদ' যদি পৃথিবী হতে

১২৩২৫৬ মাইল দূরে হয়, আর শব্দের গতি যদি মিনিটে ৪ মাইল হয় তবে চন্দ্রের অধিবাসীদের নিকট ওয়াটারলু যুদ্ধের খবর পৌঁছতে কতক্ষণ সময় লাগবে ?' বিডার এক মিনিটের মধ্যেই সঠিক উত্তর দিলেন ২১ দিন ৯ ঘণ্টা ৩৪ মিনিট। ১৮১৬ সালে যখন তাঁর বয়স ঠিক ১০ বৎসর তখন তিনি এক মিনিটে এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করতে পারতেন: বৎসরে শতকরা ৫ পাউণ্ড হিসাবে সুদ হলে ১১,১১১ পাউণ্ডের ১১,১১১ দিনের সুদ কত ? উত্তর ১৬৯১১ পাউণ্ড ১১ শিলিং, যদি একখানি চাকার পরিধি ৬ ফুট ১০ ইঞ্চি হয়, তাহলে ৪০০০০০০০০০০ মাইল যেতে ঐ চাকা কতবার ঘুরবে ? মাত্র পঞ্চাশ সেকেণ্ডের মধ্যে উত্তর—৭২৪১ ১৪২৮৫৭০৪ বার। ১১৯৫৫০ ৬৬৯১২১ এর বর্গমূল কত ? ত্রিশ সেকেণ্ডের ভেতর নির্ভুল উত্তর ৩৪৫৭৬১। বিডারের স্মরণশক্তিও অসাধারণ রকম প্রখর ছিল। একবার তাঁকে একটি বিরাট সংখ্যা উল্টা দিক হতে পড়ে শুনান হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ উহা সোজাভাবে বলেন। এক ঘণ্টা পরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় সংখ্যাটি তখনও তাঁর স্মরণে আছে কিনা। তিনি অমনি সংখ্যাটি পুনরায় নির্ভুলভাবে আওড়িয়ে যান। ৪৩ অঙ্কের এই বিরাট সংখ্যা উল্টা দিক হতে শুনে সোজাভাবে বলা এবং তাহা মনে রেখে পুনরাবৃত্তি করা অসামান্য স্মৃতিশক্তি ও গণনাশক্তির পরিচায়ক সন্দেহ নেই। সংখ্যাটি ছিল এই—২ ৫ ৬ ৩ ৭ ২ ১ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৩ ৪ ৬ ১ ৫ ৯ ৮ ৭ ৪ ৬ ২ ৩ ১ ৯ ০ ৫ ৬ ০ ৭ ৫ ৪ ১ ১ ২ ৮ ৯ ৭ ৫ ২ ৩ ১ বিডারের গণনাশক্তি অন্তিমকাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

* * *

বিডারের সমসাময়িক আর এক জন আমেরিকান গণকের কথা শোনা যায়। এঁর নাম জিরা কোলবার্ন। ইনি ১৮০৪ সালে যুক্ত রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর পিতা একজন কৃষক ছিলেন। ছয় বৎসর বয়সেই ইনি মানসাঙ্কে অদ্ভুত পারদর্শিতার পরিচয় দেন। ইহার পর আমেরিকার নানাস্থানে ঘুরে তিনি নিজের আশ্চর্য গণনাশক্তি প্রদর্শন করে বেড়াতে থাকেন। ১৮১২ সালে কোলবার্ন ইংলণ্ডে

আগমন করেন। এখানে বহু সুদক্ষ পর্যবেক্ষক তাঁকে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করে দেখেন। তিনি মুহূর্তের মধ্যেই চার অঙ্কের গুণফল বলে দিতে পারতেন। তাঁকে ২১৭৩৪ ও ৫৪৩ এর গুণফল কত প্রশ্ন করা হলে তিনি তখনি উত্তর দেন ১১৮০১৫৬২। ৮ এর ১৬ শক্তি অর্থাৎ ৮ যোলবার গুণ করলে কত হয়, জিজ্ঞাসা করা হলে কয়েক সেকেণ্ডের ভিতর তিনি উত্তর দেন ২ ৮ ১ ৪ ৭ ৪ ৯ ৭ ৬ ৭ ১ ০ ৬ ৫ ৬। ১০৬৯২৯-এর বর্গমূল কত প্রশ্ন করা হলে তিনি তখনি সঠিক উত্তর বলে দেন। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য জনক ছিল তাঁর গুণনীয়ক নির্ণয় করবার ক্ষমতা। ১৭১৩৯৫-এর কি কি গুণনীয়ক জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন—৫, ৭, ৫ ৯ ও ৮৩। তাঁকে একবার ৩৩৩ এর গুণনীয়ক নির্ণয় করতে বলা হয় তিনি বলেন উহার একটিও গুণনীয়ক নেই।

১৮১৪ সালে তাঁকে প্যারিসে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তৎকালীন রাজনৈতিক গোলযোগের মধ্যে তাঁর প্রতি কারও বিশেষ দৃষ্টি পড়ে নি। কোলবার্নের ইংরাজ ও আমেরিকান শুভানুধ্যায়ীরা তাঁর শিক্ষা-কল্পে কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করেন এবং তার ফলে তিনি লণ্ডন ও প্যারিসে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, উচ্চ শিক্ষা পাবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর গণনাশক্তির অবনতি ঘটতে থাকে। ইহার পর তিনি নানারকম পেশা অবলম্বন করেন। প্রথমে তিনি রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন, সেখানে সুবিধা না হওয়ায় কিছুদিন স্কুল মাস্টারী করেন। তদনন্তর অল্পকাল প্রচারকের কাজ করেন। অবশেষে তিনি ভাষা-তত্ত্বের অধ্যাপক হন। তিনি নিজের একখানি আত্মজীবনী লিখে গিয়েছেন, উহাতে তিনি তাঁর গণনাপ্রণালী লিপিবদ্ধ করেছেন। ১৮৪০ সালে কোলবার্ন পরলোকগমন করেন।

জোহান ডেস নামে একজন জার্মান গণক ছিলেন। ইঁহার গণনা-শক্তিও কম আশ্চর্যজনক নয়। ডেস ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে হামবার্গে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন; কিন্তু অঙ্ক ছাড়া আর কোন বিষয়েই তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল না। কিন্তু তিনি লোকের

বিশ্বাসভাজন ছিলেন বলে সারাজীবন বিভিন্ন সরকারী পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনি জার্মানী, অষ্ট্রিয়া এবং ইংলণ্ডে নিজের গণনা কৌশল প্রদর্শন করেন। ১৮৬১ সালে জোহান ডেস ইহলোক ত্যাগ করেন।

ডেসের মানসাঙ্কে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন— ৭৯৫৩২৮৫৩ কে ৯৩৭৫৮৪৭৯ দিয়ে গুণ করলে কত হয়, জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি ৫৪ সেকেণ্ডের মধ্যে নির্ভুল উত্তর বলে দেন। এইরূপ কুড়িটি অঙ্কের দুইটি সংখ্যার গুণফল নির্ধারণ করতে ডেসের ৬ মিনিট সময় লাগে: ঐ প্রকার চল্লিশটি অঙ্কবিশিষ্ট দুটি সংখ্যার গুণফল নির্ণয় কবতে তাঁর ৪০ মিনিট লাগে; কিন্তু একশটি অঙ্ক সম্বলিত দুটি সংখ্যার গুণফল বার করতে তাঁর ৮ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট লেগেছিল। জোহান ডেস একবার একশ'টি অঙ্কবিশিষ্ট একটি সংখ্যার বর্গমূল ৫২ মিনিটের মধ্যে বার করে ফেলেন। কাগজ পেন্সিলের সাহায্য ব্যতিরেকে এত বড় বড় অঙ্ক কষা বিশেষ আয়াসসাধ্য কাজ, ডেস ছাড়া আর কেহই তা পারেন নি। এতদ্ব্যতীত ডেসের আর একটি অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল, তিনি একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করেই পালে কয়টি ভেড়া কিম্বা তাকে ক'খানি বই আছে বলে দিতে পারতেন। তাঁকে কোন পুস্তকের একটি লাইন দেখিয়ে উহাতে ক'টি অক্ষর আছে প্রশ্ন করা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ নির্ভুলভাবে তা বলতে পারতেন।

ইটালীতে জ্যাকুইস ইনাডি মানসাঙ্কে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। তিনি ১৮৬৭ সালে অনোরাইটোতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনাডির প্রথম জীবন মেষপালকরূপে অতিবাহিত হয়। ঐ সময় যখন তাঁর হাতে কোন কাজ থাকত না, তখন তিনি সংখ্যাতত্ত্ব চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন। ১৮৭৩ সালে প্রথম তাঁর গণনাশক্তির উপর লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ইহার কিছুকাল পরে তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে পর্যটনে বার হন এবং পথে পথে নিজের গণনাশক্তি দেখিয়ে সামান্য অর্থোপার্জন করতে থাকেন। ১৮৮০ সালে ইনাডি প্যারিসে আগমন করেন। সকলেই তাঁর বিনয় সরলতা ও উদারতা দেখে মুগ্ধ হন। তখন তিনি লিখতে পড়তে জানতেন না পরে শিখেছিলেন।

ইনাডি এই ধরনের অঙ্ক মনে মনে কষে ফেলতে পারতেন, যেমন—একুশটি অঙ্ক সম্বলিত একটি সংখ্যা হতে একুশটি অঙ্ক সম্বলিত আর একটি সংখ্যা বিয়োগ করা, প্রত্যেকটিতে ছয়টি অঙ্ক আছে এরকম পাঁচটি সংখ্যার যোগফল বার করা, চার অঙ্কের দুইটি সংখ্যার গুণফল নির্ণয় করা, নয়টি অঙ্ক সম্বলিত কোন সংখ্যার ঘনমূল বার করা, নির্দিষ্ট তারিখে কি বার ঠিক করা ইত্যাদি তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, ১৮ বৎসর ৭ মাস ২১ দিন ৩ ঘণ্টায় কত সেকেণ্ড হয়, তিনি মাত্র ১৩ সেকেণ্ডের মধ্যে নির্ভুল উত্তর বলে দেন। ইনাডি দিনরাত অঙ্ক নিয়ে এত মাথা ঘামাতেন যে, নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নেও তিনি বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে ফেলতেন। তাঁর স্মরণ শক্তিও অত্যন্ত প্রখর ছিল। ১২ মিনিটের মধ্যে তিনি একশ'টি অঙ্ক নিয়ে গঠিত একটি সংখ্যা মুখস্থ করে ফেলতেন। কোন এক সময় আট দিন পূর্বে উত্থাপিত কোন প্রশ্নের অন্তর্গত চব্বিশটি অঙ্কের একটি সংখ্যার কথা হঠাৎ তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়। কিন্তু তিনি কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করে তখনি ঐ সংখ্যা নির্ভুলভাবে বলে যান।

সুবিখ্যাত বিদ্যুৎবিশারদ আম্পিয়ার ও গশ উভয়েই অসামান্য গণনা-শক্তির অধিকারী ছিলেন। ইহাদের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা বিভিন্নমুখী ছিল।

আমাদের দেশে শ্রীযুক্ত সোমেশ চন্দ্র বসু মানসাঙ্কে অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়ে গিয়েছেন। তিনি একবার কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে সমবেত অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দের সম্মুখে ত্রিশটি সংখ্যাযুক্ত একটি বৃহৎ রাশিকে ত্রিশটি সংখ্যাযুক্ত অপর একটি রাশি দিয়ে মনে মনে গুণ করে অল্পক্ষণের মধ্যেই উত্তর বলে দেন। পাশ্চাত্ত্যদেশে পরিভ্রমণকালে তিনি আর একবার ১০০টি সংখ্যার এক বিরাট রাশিকে ১০০ সংখ্যার অন্য এক রাশি দিয়ে মুখে মুখে গুণ করে এক ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে সঠিক উত্তর বলে দিতে সক্ষম হন। আমেরিকার অবস্থানকালে আর এক সময়ে সোমেশচন্দ্র একজন কারা অধ্যক্ষের বয়স শুধু চেহারা দেখেই নির্ভুলভাবে বলে দিতে সমর্থ হন। সেখানে তিনি হিন্দুযোগী

নামে পরিচিত ছিলেন। বর্তমান কালে এদেশে শকুন্তলা দেবী মানসাঙ্কে আশ্চর্য পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছেন।

পেরিক্লেস ডিয়ামাণ্ডি নামক আর একজন গ্রীক গণকের কথা জানা যায়। ইনি ১৮৬৮ সালে আয়োনিয়ান দ্বীপপুঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সুশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন এবং ছাত্র জীবনে অঙ্কে বরাবর প্রথম হতেন। ফ্রান্সের তুইজন প্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদ অধ্যাপক শার্কো ও বিনে ইঁহাকে খুব ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে ছিলেন। একবার একজন সহকারী বোর্ডের উপর এই সংখ্যাগুলি লেখেন—

৪৯৩৫৭

৮০২৪৬

৯৫৩১৪

২৭৬৯৫

৭৬২৩২

ডিয়ামাণ্ডি এই সংখ্যাগুলির দিকে একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করে অন্য পাশে ফিরে সমগ্র রাশিগুলি উপর হতে নীচে, বাঁ-দিক হতে ডান দিকে কিম্বা কোনাকুনি অথবা উল্টা দিক হতে নির্ভুলভাবে আওড়িয়ে যান। পনের অঙ্ক-বিশিষ্ট এক রাশিকে চার অঙ্কের এক রাশি দিয়ে গুণ করতে বলা হলে তিনি আধ মিনিটের মধ্যেই সঠিক উত্তর বলে দেন। দশ সংখ্যা-বিশিষ্ট এক রাশির বর্গমূল তিনি তু'মিনিটের মধ্যে মুখে মুখে বার করতে সক্ষম হতেন। কোন তারিখে কি বার হবে ডিয়ামাণ্ডি তা' সঙ্গে সঙ্গে বলে দিতে পারতেন। ডিয়ামাণ্ডির আর একরকম অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। কোন লোকের মুখ দেখে তার মনের ভাব তিনি নিখুঁতভাবে বর্ণনা করতে পারতেন।

সুবিখ্যাত গণক লুই ফ্লুরি জন্মান্ধ ছিলেন, ইনি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে বেলফোর্টে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে সময় কাটাবার জন্য ইনি নিজে নিজে গণনাশক্তির চর্চা আরম্ভ করেন এবং ক্রমে ক্রমে তাঁর এই ক্ষমতা অদ্ভুতরকম বিকাশ প্রাপ্ত হয়। তাঁর মানসিক গণনাশক্তির কয়েকটি আশ্চর্য উদাহরণ নীচে দেওয়া গেল। প্রশ্ন: ৬৪৯কে ৬৬৭ দিয়ে গুণ

করলে কত হয়? উত্তরঃ ২৩৮১৮৩, দশ সেকেণ্ডের মধ্যে। ২০৭০০কে ৮ দিয়ে ভাগ দিলে কত হবে? উত্তরঃ ভাগশেষ ১২, ভাগফল ৪৩১, তিন সেকেণ্ডের মধ্যে। ১৩২৫০-র বর্গমূল কত? উত্তরঃ ১১৫, অবশিষ্ট ২৫, চার সেকেণ্ডের মধ্যে। ফ্লুরি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে কোন দিনে কি বার হবে তা প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে বলে দিতে পারতেন।

ম্যাডময়শিলে ওসাকা নামে পরিচিত একজন ফরাসী মহিলা গণনাকারিণীর কথা শোনা যায়। ইনি কোন স্থানে অসাধারণ গণনা-শক্তির প্রদর্শনী দেখে নিজে এই বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভের জন্য অনবরত চেষ্টা করতে থাকেন। অবিরাম চর্চার ফলে তাঁর সংখ্যার স্মৃতি অসামান্য রকম তীক্ষ্ণ হয়ে উঠে। ডাক্তার অস্টি পরীক্ষার জন্য এঁর সামনে একশতটি সংখ্যা সেকেণ্ডে একটি করে—ধীরে ধীরে উচ্চারণ করেন। আশ্চর্যের বিষয় ওসাকা অল্পক্ষণ পরেই সেই সমস্ত সংখ্যাই নির্ভুলভাবে পর পর বলে দেন। এমন কি উল্টা দিক হতে এই সব সংখ্যা বলতে অনুরোধ করা হলে তিনি সঠিকভাবে তা' সম্পাদন করেন। একজন ৬২৪৯৮৭কে ২৩৫৮ দিয়ে গুণ করলে কত হয় জিজ্ঞাসা করেন, ওসাকা এক মিনিটের মধ্যে নির্ভুল উত্তর বলে দেন। কেহ নিজের জন্মতারিখ উল্লেখ করলে ওসাকা সঙ্গে সঙ্গে তাহার বয়স কত দিন, কত ঘণ্টা, কত মিনিট ও কত সেকেণ্ড তৎক্ষণাৎ বলে দিতেন। ৯৭-এর দশম শক্তি প্রশ্ন করা হলে তিনি মুহূর্তের মধ্যেই উত্তর বলে দেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা ওসাকা অসাধারণ গণনাশক্তির অধিকারিণী হলেও তাঁর ভাষাজ্ঞান নিতান্ত সামান্য ছিল।

মরিস দাগোবার্ট ১৯৪৬ সালে প্যারিসে যে যাদুকর সম্মিলনী হয়েছিল তাতে নিজের গণনাশক্তি প্রদর্শন করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ও প্রশংসালাভে সক্ষম হন। তিনি সুমধুর স্বরে বেহালা বাজাতে বাজাতে বিভিন্ন প্রকার অঙ্ক মনে মনে সম্পন্ন করে নির্ভুল উত্তর বলে দিতেন। তিনি মাত্র ১৫ সেকেণ্ডের মধ্যে কোন সংখ্যার সপ্তম মূল বের করতে পারতেন। ইনি ৮২৭-এর তৃতীয় শক্তি

(অর্থাৎ ৮২৭ × ৮২৭ × ৮২৭), ৫৫ সেকেণ্ডের মধ্যে নির্ভুলভাবে নির্ণয় করেন।

কোন কোন যাতুকর এইরূপ গণনাশক্তি ও পর্যবেক্ষণ-শক্তির ভাল রকম চর্চা করে উহার সাহায্যে নানারকম অত্যাশ্চর্য যাতুবিদ্যা দেখিয়ে লোকের বিস্ময় উৎপাদন করে থাকেন। এই প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ ফরাসী যাতুকর রবার্ট হুডিনের নাম বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য।

কেহ কেহ বলেন, এই সকল অসাধারণ গণক জন্ম হতেই অসামান্য গণনাশক্তির অধিকারী। আবার কাহারও মতে অধ্যবসায় ও অভ্যাসই ইঁহাদের সাফল্যের মূল কারণ। তবে যতদূর মনে হয় উত্তম স্মরণশক্তি-সম্পন্ন কোন ব্যক্তি যদি বাল্যকাল হতে একমনে সযত্নে মানসাঙ্ক অভ্যাস করতে থাকেন তাহলে পরে নিশ্চয়ই তাঁর পক্ষে এই প্রকার অসাধারণ গণনাশক্তি লাভ করা সম্ভব।

অঙ্কের কৌতুক

সবচেয়ে বড় মূল সংখ্যা (Prime Number) কি, বলতে পার? মূল সংখ্যা বলতে বুঝায়, যে সংখ্যার কোন গুণনীয়ক (Factor) হয় না; অর্থাৎ তাকে যে কোন সংখ্যা দিয়েই ভাগ করা যাক না কেন, সামান্য কিছু ভাগশেষ নিশ্চয়ই অবশিষ্ট থাকবে। এড্‌ওয়ার্ড লুকাস ১৮৭৭ সালে এই রকম একটা রাশি আবিষ্কার করেন। সেটা হচ্ছে—১৭০, ১৪১, ১৮৩, ৪৬০, ৪৬৯, ২৩১, ৭৩১, ৬৮৭, ৩০৩, ৭১৫, ৮৮৪, ১০৫, ৭২৭ রাশিটিকে স্মরণ রাখতে হলে শুধু $২^{১২৭}$—১ এটুকু মনে রাখলেই চলবে। এপর্যন্ত এর কোন গুণনীয়ক বের করা সম্ভব হয় নি। ডোনালড গিলিস আবিষ্কৃত $২^{১১২১৩}$—১ উল্লেখযোগ্য।

মনে কর, তোমার বইয়ের তাকে ১৫খানি পুস্তক আছে। এই পুস্তকগুলিকে আগে পরে নিয়ে তুমি কত রকম ভাবে সাজাতে পার? যদি প্রতি মিনিটে একবার করেও নতুন ভাবে সাজানো হয়, তাহলেও তোমার ২৪৮৭৯৯৬ বছর সময় লেগে যাবে।

এবার একটি গাণিতিক গল্প বলবো। দাবা খেলার ছকে ৬৪টি ঘর আছে—এটা বোধ হয় তোমরা সকলেই জান! শোনা যায়, এক রাজা দাবা-বড়ের নানারকম বিচিত্র সব চালচলন দেখে বিশেষ সন্তুষ্ট হয়ে এই খেলার আবিষ্কর্তাকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করতে চাইলেন। তাঁর আদেশে আবিষ্কারককে অবিলম্বে তাঁর সামনে উপস্থিত করা হলো। রাজা তাকে ইচ্ছামত যে কোন পুরস্কার চেয়ে নিতে বললেন। সে একটু ভেবে বললো, দাবা-বড়ের ছকের প্রথম ঘরের জন্যে একটি মাত্র গমের দানা, দ্বিতীয় ঘরের জন্যে দুটি দানা, তৃতীয় ঘরের জন্যে ৪টি দানা—এভাবে ৬৪টি ঘর অবধি গমের দানা প্রদান করলেই তার অন্তরের আকাঙ্খা পরিপূর্ণ হবে। রাজা তৎক্ষণাৎ তাকে ঠিক সেই রকম ভাবে গমের দানা প্রদান করতে মন্ত্রীকে আদেশ করলেন। এক দিন পরে, মন্ত্রী মহাশয় বিশেষ চিন্তিত মুখে এসে রাজাকে জানালেন যে, এই রকম প্রস্তাবমত গমের দানা দিতে গেলে যত গম লাগবে, তত গম রাজভাণ্ডারে নেই। রাজা তখন জানতে চাইলেন সঠিক সংখ্যা কত হতে পারে। মন্ত্রী বললেন ঠিক ঐ রকমভাবে (১ + ২ + ৪ + ৮ + ১৬ + ৩২ + ৬৪ + ১২৮ + ২৫৬) গুণে দেখলে এই ক্রমবর্ধমান সংখ্যা হবে ১৮৪৪৬৭৪৪০৭৩৭০৯৫৫১৬১৫। শুনে রাজার তো চক্ষু স্থির!

এখন একটা মজার অঙ্কের কথা বলছি। তোমার বন্ধুকে ৩-এর বেশী কোন একটি মূল সংখ্যা (Prime Number) ভাবতে বল। তারপর তাকে তা দিয়েই গুণ করতে বল। এরপর তাতে ১৭ যোগ করে ১২ দিয়ে ভাগ করতে বল। এবার আর কোন প্রশ্ন না করেই দৃঢ়কণ্ঠে বলে দাও, ভাগশেষ অবশ্যই ৬ হয়েছে। সে খুবই অবাক হয়ে যাবে। উদাহরণ—(৭ × ৭ + ১৭) ÷ ১২ = ৫$\frac{৬}{১২}$

কোন দর্শককে এক হাতে এক নয়া পয়সা ও অন্য হাতে পাঁচ নয়া পয়সা নিতে বল। এরপর তাকে বল বাঁ হাতে যত নয়া পয়সা আছে, তাকে ১৯ দিয়ে গুণ করতে, আর ডান হাতে যত নয়া পয়সা আছে তাকেও ১৯ দিয়ে গুণ করতে। ইত্যবসরে তার মুখের ভাব তুমি খুব

মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করতে থাকবে। যে হাতের বেলায় গুণ করতে তার বেশী সময় লাগবে, সেই হাতে নিশ্চয়ই পাঁচ নয়া পয়সা আছে, আর তাহলে অপর হাতে অবশ্যই এক নয়া পয়সা থাকবার কথা! ১-কে ১৯ দিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই গুণ করা যায়, কিন্তু ৫ কে ১৯ দিয়ে মনে মনে গুণ করতে হলে একটু সময় লাগে। সুতরাং ঐ গুণ ফল দুটি এক সঙ্গে বলে দেবার পর দর্শককে আর কোন রকম প্রশ্ন না করেই তুমি অনায়াসে বলে দিতে পারবে, তার কোন হাতে কি মুদ্রা লুকানো আছে। এটা একটা খুব সুন্দর অথচ সহজ থট রিডিং এর খেলা, হঠাৎ দেখে কিন্তু সবাই অবাক হয়ে যায়।

অঙ্কের মজা

৫২৬, ৩১৫, ৭৮৯, ৪৭৩, ৬৮৪, ২১০

আঠারোটি অঙ্কবিশিষ্ট ওপরের এই বিরাট রাশির অদ্ভুত এক গুণ আছে। একে ১ থেকে ১৯ পর্যন্ত যে কোন সংখ্যা দিয়ে গুণ করা যাক না কেন আগেকার সব কটি অঙ্কই (digit) সার বেঁধে ঠিক পর পর ফিরে আসবে। যেমন এই রাশিকে ৭ দিয়ে গুণ করলে হয় ৩, ৬৮৪, ২১০, ৫২৬, ৩১৫, ৭৮৯, ৪৭০ আর ১৬ দিয়ে গুণ করলে ৮৪, ২১০, ৫২৬, ৩১৫, ৭৮৯, ৪৭৩, ৬০ হয়। এই যাদু রাশিকে মনে রাখবার একটা সহজ উপায় আছে, ১ কে ১৯ দিয়ে দশমিকে রূপান্তরিত করতে পারলে এই মজার সংখ্যাটি পাওয়া যায়।

এই আশ্চর্য সংখ্যার সাহায্যে বড় বড় গুণ খুব তাড়াতাড়ি মনে মনে সম্পন্ন করে সকলকে বেশ অবাক করে দেওয়া যায়! একে ১ থেকে ১৯ পর্যন্ত যে কোন সংখ্যা দিয়ে মুখে মুখে খুব সহজে গুণ করা সম্ভব! এবার সেই প্রক্রিয়ার কথা বলছি। এই অদ্ভুত রাশি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে এতে ৯ ও ০ ছাড়া আর সব অঙ্কই দুবার করে আছে। কোন সংখ্যা দিয়ে গুণ করবার সময় রাশিকে দুই ভাগ করে নিতে হবে, যে সংখ্যা গুণকের সমান, কিম্বা গুণক দুই অঙ্কের হলে তার এককের সমান—সেই সংখ্যার পর

থেকেই এই বিভাগ আরম্ভ হবে। এই সীমা রেখার পর প্রথমে সব সংখ্যাগুলি পরপর বসিয়ে, তারপর এর আগের সব সংখ্যাগুলি উল্লেখ করে সবশেষে একটি ০ যোগ করে দিলেই গুণটি ঠিক হবে। গুণক ২ থেকে ৯এর মধ্যে হলে গুণ্যের অন্তর্গত নিম্নতর সংখ্যার পর ব্যবধান হবে আর গুণক ১১ আর ১৮র মধ্যে হলে গুণ্যের মধ্যবর্তী উচ্চতর সংখ্যার পর এই ছেদ ঘটবে। দুইটি উদাহরণ দিলেই এই ব্যাপার স্পষ্ট বোঝা যাবে। মনে কর ৩ দিয়ে ওপরের ঐ সংখ্যা গুণ করতে হবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি উক্ত রাশির মধ্যে ৩ ও ১ এবং ৩ ও ৬ এই দুই জায়গার মাঝে বিচ্ছেদ করা যায়, কিন্তু যেহেতু ৩ হচ্ছে ২ ও ৯ এর মধ্যবর্তী সংখ্যা সেজন্য পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী ৩ ও ১ এর মধ্যে সীমারেখা টানতে হবে। তাহলে প্রথমে ১৫, ৭৮৯, ৪৭৩, ৬৮৪, ২১০ লিখে তারপর ৫২৬৩ স্থাপন করে শেষে একটি ০ করে দিলেই আমাদের গুণটি হয়ে যাবে এবং উত্তর হবে ১৫, ৭৮৯, ৪৭৩, ৬৮৪, ২১০, ৫২৬, ৩০।

এবার মনে কর ১৪ দিয়ে গুণ করতে হবে; সুতরাং বিধিমত ৪ ও ৭ এবং ৪ ও ১ এই দুইয়ের মধ্যে ছেদ টানা যায়, কিন্তু আগেকার নিয়ম অনুসারে যেহেতু ১১ আর ১৮র মাঝখানে ১৪র স্থান, সেজন্য উচ্চতর সংখ্যা ৪ ও ৭ এর মধ্যে ব্যবচ্ছেদ করতে হবে। তাহলে প্রথমে ৭৩, ৬৮৪, ২১০ লিখে, তারপর ৫২৬, ৩১৫, ৭৮৯৪ বসাতে হবে এবং শেষে ০ জুড়ে দিতে হবে, তাহলে আমাদের গুণফল হয় ৭৩,৬৮৪, ২১০, ৫২৬, ৩১৫, ৭৮৯,৪০।

এবার তিন অঙ্কের একটি ছোট্ট অঙ্ক লিখছি—৯ দেখতে সামান্য বোধ হলেও এর অর্থ হচ্ছে ৯ কে সব শুদ্ধ ৯ × ৯ × ৯ × ৯ × ৯ × ৯ × ৯ × ৯ × ৯ শক্তি সম্পন্ন করতে হবে, অথবা ৯ কে ৯ দিয়ে ৩৮৭, ৪২০, ৪৮৯ বার গুণ করতে হবে। এর যা উত্তর হবে তাতে ছত্রিশ কোটি নব্বই লক্ষ অঙ্ক (digit) থাকবে। যদি পাঁচটি অঙ্ক লিখতে এক ইঞ্চি লম্বা জায়গা লাগে। তাহলে এই উত্তর লিখতে ১১৬৪ মাইল লম্বা কাগজের ফিতা দরকার হবে এবং একজনের জীবনকালে এ কাজ সুসম্পন্ন হবে না।